চিরঞ্জীব সেন

হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭ সাল
জুলাই ১৯৬০
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

কল্যাণীয়া

দোলাকে

—চিরঞ্জীব দাস

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
প্ল্যানেট মিস্ট্রি
সিক্রেট স্পাই
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা
লস্ট আটলান্টিস
কঙ্গোরিলা

মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে অনতিদূরে 'ভ্যালি অফ দি কিংস' যার চতুর্দিকে কেবল বালি আর বালি। সেই বালির রাজ্যে এখানে ওখানে দাড়িয়ে আছে মিশরের প্রাচীন রাজাদের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, তাই বুঝি এই মরু উপত্যকার নাম 'ভ্যালি অফ দি কিংস'।

কীর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবশ্যই পিরামিডগুলি। পিরামিডগুলির ভেতর থেকে পাওয়া গেছে বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন, অর্থের অঙ্কে যার মূল্য ধার্য করা যায় না।

আমরা শুনে আসছি খ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে মিশরের ফারাওরা পিরামিডগুলি তৈরি করেছিলেন। তাঁদের নাকি উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের মৃতদেহ 'মমি' করে রাজকীয় আড়ম্বরে পিরামিডের ভেতরে সমাধি দেওয়া হবে!

বর্তমানে গবেষকরা বলছেন যে ফারাওদের আবির্ভাবের অনেক আগেই নাকি পিরামিডগুলি তৈরি হয়েছিল এবং কোনো ফারাও-এর মৃতদেহ সমাধি দেবার উদ্দেশ্যেও পিরামিড তৈরি হয় নি। পরে হয়ত কোনো কারণে কোনো ফারও-এর মৃতদেহ পিরামিডের ভেতরে রাখা হয়েছিল কিন্তু পিরামিড নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন। কি সেই উদ্দেশ্য?

পিরামিড কি শুধু মিশরেই আছে? তা নয়। পিরামিড আছে মেকসিকোতে, পেরুতে, চীনে, তিব্বতে এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও।

ভিন্ন দেশে এই সব পিরামিড কারা তৈরি করেছিল? গ্রহান্তরের মানুষ? পিরামিড নির্মাণে প্রাচীন ভারতীয় ও ককেশিয় সভ্যতার কি কোনো অবদান আছে? গবেষকরা নতুন করে ভাবছেন।

একটা প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। পিরামিড, মমি এবং পিরামিডের ভেতরে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলি কি অভিশপ্ত ?

জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তথাপি রিচার্ড অ্যাডামসনের কথা শুনতে হয়। রিচার্ড অ্যাডামসনের এখন বয়স ৮৩, বেচারীর দু'টি পা হালে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ইংলণ্ডে পোর্টসমাথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় সে এক বিবৃতি দিয়েছে।

রিচার্ড অ্যাডামসন বলছে যে ১৯২২ সালে লুকসরের কাছে যখন টুটানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হলো তখন সে কবরখানা পাহারা দেবার জন্যে একজন রক্ষী নিযুক্ত হয়েছিল। ঐ কাজে সে দশ বছর নিযুক্ত ছিল।

অভিশাপের ব্যাপারটা তার মতে সম্পূর্ণ বাজে। সে নিজেই তো পিরামিডে কবর-খানার ভেতরে সাত বছর ঘুমিয়েছিল। তার শোবার স্থান ছিল কবরখানার ভেতর। তার তো কিছু হয় নি বরঞ্চ এই সাত বছর তার স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল। তাহলে এই অভিশাপের কথা উঠলো কি করে ? ইংলণ্ডের একটি খবরের কাগজের রিপোর্টারের মাথা থেকে এটি বেরিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল চোর ও দস্যুদের দূরে রাখা কারণ প্রাপ্ত মূল্যবান সামগ্রী চুরি বা হাতাবার উদ্দেশ্যে বিলেত থেকেও লোক মিশরে যাচ্ছিল।

তবুও অভিশাপের প্রবাদ মিশরে টুটানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হওয়ার আগে থেকেই চালু ছিল। কোনো কোনো প্রাচীন কবরে লেখাও ছিল, 'ছুঁলেই মৃত্যু'। কিছুকাল আগে রিচার্ড অ্যাডামসন কার্ডিফের একটি টেলিভিসন কোম্পানিকে মমির অভিশাপ সম্বন্ধে একখানি চিঠি দেয়। ঐ চিঠি পাবার পর ঐ টি ভি কোম্পানি অ্যাডামসনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। পরে তারা কৌতূহলী হয়ে 'দি কার্স অফ কিং টুট' নামে একটি ছায়াছবি সবে সম্পূর্ণ করেছে।

টি ভি কোম্পানির একজন মুখপাত্র মিঃ বব সিমনস বলছে আমরা অভিশাপে বিশ্বাস করি। ছবি তোলবার আগে অনেক গোলমাল তো হয়েছেই যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু অভিশাপ না থাকলে শুটিং-এর প্রথম দিনেই পিরামিডের কাছে ছবির অভিনেতা আয়ান ম্যাকশেন মোটর দুর্ঘটনায় পা ভাঙবে কেন ? জ্যোতিষীর পরামর্শে অভিনেত্রী জোন কলিনস অভিনয় করতে রাজি হলেন না কেন ?

এই বইয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যা পড়ে পাঠকগণই বিচার করবেন

অভিশাপ আছে কি নেই !

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ চিয়পস পিরামিডের ভেতরে কিংস চেম্বারে নেপোলিয়ন একা প্রবেশ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন যেন ভিন্ন মানুষ, মুখে বুঝি এক ফোঁটাও রক্ত নেই, রীতিমতো ভীত। তিনি কি দেখেছিলেন ? সে কথা কি কাউকে বলেছিলেন ?

এসব তো হলো অতীতের কথা কিন্তু বর্তমানে পিরামিডের নতুন এবং ভিন্ন ধরনের রহস্য সারা দুনিয়াকে ভাবিয়ে তুলেছে। দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা সেইসব রহস্য সমাধানে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক কি হয়।

এই বই লেখবার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর প্রেরণা অস্বীকার করবার কোনো উপায়ই নেই। তিনি স্বামীজি ও নেতাজী নিয়ে নিজে ডুবে আছেন, আমাদেরও ডোবাচ্ছেন।

—লেখক

কৌতূহলী পাঠকগণ নিম্নোক্ত বইগুলি পড়তে পারেন :

1. The Pyramids of Egypt
   by E. I. S. Edwards
2. The Great Pyramid : It's Divine Message
   by David Davidson
3. Pyramid Power
   And
4. Beyond Pyramid Power
   by G. Pat Flanagan
5. Mysterious Pyramid Power
   edited by Martin Ebon
6. Great Pyramid Proof of Good
   by George R Riffert
7. The Secrect Power of the Pyramids
   by Bill and Pettit Schul
8. The Secrect Forces of the Pyramids
   by Warren Smith
9. The Greatest Pyramid : Why was it Built ?
   by John Taylor
10. Secrets of the Great Pyramid
    by Peter Tompkins
11. The Great Pyramid
    by Tom Valentine
12. Pyramid Power
    by Toth, Max and Nielson
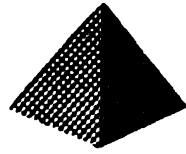
অভিশাপ, আছে, অভিশাপ নেই

১

১৯১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর সোমবার। ইজিপ্টের রাজধানী কায়রোতে মহম্মদ ইব্রাহিম একটা জরুরী মিটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগামী একটা মোটরের ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ফুটপাথের কোণে লেগে মাথা ফেটে গেল। আঘাত গুরুতর।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন কিন্তু দু'দিনের বেশি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। তৃতীয় দিনে মিশরের এক গুণী সন্তান মহম্মদ ইব্রাহিম মারা গেলেন। ইজিপ্টে এক শ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করলেন মিশরের মমির অভিশাপ আজও সক্রিয় আছে। সে অভিশাপ প্রাচীন কোনো ফারাও-এর হতে পারে, পিরামিডেরও হতে পারে। সেই অভিশাপই মহম্মদ ইব্রাহিমের মৃত্যুর কারণ।

মিঃ ইব্রাহিম হলেন ইজিপ্ট সরকারের ডিরেক্টর অফ অ্যান্টিকুইটিজ, পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। প্যারিসে একটা বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের ইচ্ছে যে এই প্রদর্শনীতে টুটানখামেনের কবর থেকে সংগৃহীত এমন কিছু প্রাচীন সামগ্রী দেখানো হোক যা আগে কোথাও দেখা যায় নি। এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে প্যারিস থেকে ফরাসি সরকারের একদল প্রতিনিধি কায়রোতে এসেছিলেন। ইজিপ্ট সরকারের মিনিস্ট্রি অফ কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে উক্ত তারিখে মিটিং আহূত হয়েছিল এবং সেই মিটিং-এ মিঃ ইব্রাহিম উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ চার মাস ধরে উভয় সরকারের মধ্যে চিঠি-চাপাটি চলছিল। প্রাচীন কোনো মিশরীয় নিদর্শন বিদেশে পাঠাতে মিঃ ইব্রাহিম কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী চাপে পড়ে তাঁকে রাজি হতে হয়েছিল। যেদিন তিনি রাজি হলেন সেদিন তাঁর কন্যা এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিল। তিনি নিজেও স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে কথা বলার জন্য প্যারিস থেকে একদল প্রতিনিধি কায়রো এসে গেলেন। কন্যার মোটর দুর্ঘটনা এবং নিজের দুঃস্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ ইব্রাহিম নিজের সমর্থন প্রত্যাহার করলেন। তিনি কিছুতেই রাজি হতে চাইছেন না। নিজের জন্য না হলেও কন্যার কথাও ভাবলেন। মমির যদি কোনো অভিশাপ সক্রিয় থাকে তারা তো তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। অতএব⋯।

কিন্তু না, মিঃ ইব্রাহিমের প্রতিবাদ টিকলো না। মিশর সরকার বললেন ওসব অভিশাপ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়, বর্তমান যুগে ওসব অচল। কাকতালীয়বৎ ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিলে পৃথিবীতে কোনো কাজই করা যাবে না।

আর একবার সরকারী চাপে পড়ে মহম্মদ ইব্রাহিম রাজি হলেন এবং কাগজপত্রে নিজের স্বাক্ষর দিলেন। সরকারী চাপটা সম্ভবত স্বয়ং প্রেসি-ডেন্ট নাসের দিয়েছিলেন কারণ, সহযোগিতা না করলে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। নাসের তাই সে ঝুঁকি নিতে রাজি নন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন ব্যক্তি অপেক্ষা জন্মভূমি মিশর অনেক বড়।

মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতে কোথা থেকে ভীমবেগে ছুটে এলো তাঁর মৃত্যুদূত। কি ঘটলো তা তো আগেই বলা হয়েছে।

অষ্টাদশবর্ষীয় ফারাও টুটানখামেন তার মৃত্যুর তিন হাজার তিন'শ বছর পরে অমরত্ব লাভ করলো। অশোক বা শার্লেমানের মতো দূরের কথা

এমনকি হেনরি দি এইটথ-এর মতোও সে এমন কিছুই করে নি যে আজও মানুষ তার নাম করবে।
১৯২২ সালে এক পিরামিডের অভ্যন্তরে যখন তার কবর আবিষ্কৃত হলো তখন টুটানখামেনের আড়ম্বর, অতুলনীয় সম্পদ ও স্বর্ণমণ্ডিত বিভিন্ন সামগ্রীর কারুকার্য দেখে পৃথিবী বিস্মিত। লঙ্কারাজ রাবণের সভা বর্ণনায় মাইকেল মধুসূদনের সেই উক্তি মনে পড়ে, 'ভূতলে অতুল শোভা'। .
তখন থেকেই প্রবাদ চালু পিরামিডের ভেতরে রক্ষিত ওসব স্পর্শ কোরো না, ওগুলি অভিশপ্ত, স্পর্শ করলে মরবে। সত্যিই কোনো অভিশাপ আছে কি না সে নিয়ে তো অনেক রকম ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কিন্তু ঐ পিরামিড নিয়ে যে সব বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে তা আরও বেশি চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। সে কথায় পরে আসব, তার আগে অভিশাপ কিছু আছে কি না দেখা যাক।

মিশরের যে অংশে টুটানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে সেই অংশটি 'ভ্যালি অফ দি কিংস' নামে পরিচিত। মিশরীয়রা বলে 'বিবান-এল-মালুক'। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পণ্ডিতেরা এই ভ্যালি অফ দি কিংস সম্বন্ধে আগ্রহী হ'ন। তাঁদের ধারণা হয় এখানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ ও পিরামিড আছে সেগুলি অনুসন্ধান করলে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় ব্যক্তিরা কোথা থেকে কিছু কিছু প্রাচীন সামগ্রী ঐ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ বা চুরি করে সাহেবদের কাছে চড়া দামে বিক্রয় করতো। যারা কিউরিও সংগ্রহ করতো তারা ঐগুলি কিনে নিতো। দামের বিচার করতো না।
এইসব প্রাচীন নিদর্শন দেখেই ইজিপ্ট সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন সেই সব ইজিপ্টোলজিস্ট পণ্ডিতদের ধারণা হয়েছিল যে এই অঞ্চলে খননকাজ চালালে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। আবার কেউ এমন মতও প্রকাশ করলেন যে এই মরু অঞ্চলে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এতোদিনে সে সব ধ্বংস বা লুপ্ত

হয়ে গেছে। ফারাওরা সেই কবে রাজত্ব করে গেছে যীশুর জন্মের ছ'তিন হাজার বছর আগে, তার পরও হাজার বছর পার হয়ে গেছে, অতএব পরিশ্রম বিফল হবে।

কিন্তু হাওয়ার্ড কার্টার এবং জর্জ ই. এম. এস. হারবার্ট অর্থাৎ লর্ড কারনারভন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। ফারাও টুটানখামেনের নাম তাঁরা জানতেন। যীশুর জন্মের ১৩৫০ বৎসর পূর্বে টুটানখামেন রাজত্ব করতো। হাওয়ার্ড কার্টার ও লর্ড কারনারভন বিশ্বাস করতেন যে এই বিবান এল-মালুকের কোথাও না কোথাও সেই রাজার কবর লুকিয়ে আছে, হয় কোনো ধ্বংসস্তূপের নিচে কিংবা কোনো পিরামিডের ভেতর। তবে পিরামিডের ভেতরে থাকাই সম্ভব।

১৯১৯-২০ সালে ওঁরা ছ'জনে খনন কাজ আরম্ভ করলেন। ১৯২২ সালের শেষে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেল যা দেখে বোঝা গেল টুটানখামেনের কবর কাছেই কোথাও পাওয়া যাবে।

ঐ-বছরের নভেম্বর মাসের তিন তারিখে একটা পিরামিডের সামনে সিঁড়ির একটা ধাপ পাওয়া গেল। আরও খুঁড়তে খুঁড়তে পর পর ষোলটা ধাপ পাওয়া গেল। ধাপগুলি শেষ হয়েছে একটি কবরের দরজায়। মৃতের কবরের প্রতীকস্বরূপ নেক্রোপলিস-এর রাজকীয় সীল তখনও সেই দরজায় দেখা গেল। দরজার ভেতর দিকে টুটানখামেনের সীলের ছাপও দেখা গেল। কিন্তু দরজা দেখে মনে হলো এই পথ দিয়ে চোরেরা যাওয়া আসা করে। চুরি করবার মতো সামগ্রী ভেতরে তাহলে কিছু নিশ্চয় আছে।

পথ পরিষ্কার করে হাওয়ার্ড কার্টার হাতে জ্বলন্ত একটি মোমবাতি নিয়ে কবরখানার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। লর্ড কারনারভন, তাঁর কন্যা লেডি ইভলিন হারবার্ট এবং প্রফেসর ক্যালেণ্ডার বাইরে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে হাতে মোমবাতিটি নিয়ে হাওয়ার্ড কার্টার তখন সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন।

বাইরে যে তিনজন অপেক্ষা করছে তাদের কাছে একটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে

এক ঘণ্টার সমান। তাদের নিশ্বাস পড়ছে না। কার্টার গেল কোথায়? অনেকক্ষণ তো ভেতরে ঢুকেছে! কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন? শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে লর্ড কারনারভন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

কার্টার, কার্টার, তোমার সাড়া-শব্দ নেই কেন? ভেতরে কিছু দেখতে পাচ্ছ? কিছু সন্ধান পেলে?

হাওয়ার্ড কার্টার বেশি দূরেও যায় নি। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে যা দেখেছে তাইতেই সে স্তম্ভিত। চাপা গলায় সে উত্তর দিলো "ইয়েস, ওয়াণ্ডারফুল থিংস", আশ্চর্য সব সামগ্রী দেখছি।

হাওয়ার্ড কার্টারের প্রাথমিক প্রতিবেদনেই ইজিপটোলজিস্টরা অবাক। কুড়িজন ইজিপটোলজিস্ট উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে টুটানখামেনের কবরের ভেতর অর্থাৎ পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন ১৯২৩ সালের ১৭ ফেবরুয়ারি তারিখে।

হাওয়ার্ড কার্টারের হাতে শক্তিশালী একটা টর্চ, সেই গাইড। সকলকে সে নিয়ে গেল মূল চেম্বারে, যে ঘরে রক্ষিত রয়েছে টুটানখামেনের মমি। ঘরের আকার ২১ ফুট বাই ১৩ ফুট আর উচ্চতা ১১ ফুট।

মৃত রাজার কাজে লাগতে পারে এমন সব নানা রকম সামগ্রীতে ঘরটি সাজানো। স্বর্ণ-নির্মিত বা স্বর্ণ-মণ্ডিত সামগ্রীর ওপর হাওয়ার্ড কার্টার তার টর্চের আলো ফেলে আর অত্যাশ্চর্য সামগ্রী দেখে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আশ্চর্য! অভূতপূর্ব! এমন সব জিনিস যে দেখা যাবে তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

সেই তিন হাজার বছরেরও আগে যারা রাজাকে ঘরে শুইয়ে ঘর সাজিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল তারপর বোধহয় এই কুড়িজন ইজিপটোলজিস্ট ও হাওয়ার্ড কার্টার এই মূল চেম্বারে প্রবেশ করলো। আশ্চর্য হবার তো কথা কারণ প্রতিটি সামগ্রী দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র সেগুলি তৈরি করা হয়েছে। সেগুলি এখনও এতদিন পরে নতুনের মতো উজ্জ্বল।

মৃত বালক রাজা টুটানখামেনের দেহটি আবৃত থাকলেও মুখটি প্রায়

অবিকৃতভাবেই দেখা গেল। এ৫তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। তিন হাজার বছর এবং তার পর কয়েক শত বছর পার হয়ে গেছে তবুও মানবদেহ অটুট রয়েছে! সামগ্রীগুলির রং ও পালিশ এখনও উজ্জ্বল! অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য!

দর্শকদের সবচেয়ে অবাক করে দিলো মমির পাশে রক্ষিত এক গুচ্ছ শুষ্ক ফুল, এটি হয়ত সদ্য বিধবা রাণীর শেষ শ্রদ্ধার্ঘ। এতদিনেও ফুলগুলি নষ্ট হয় নি, পোকায় খেয়েও ফেলে নি। পিরামিডের অভ্যন্তর তথা রাজার মূল কবরঘরখানি এতই শুষ্ক যে একটিও পোকা দেখা যায় নি। কয়েকটা বস্ত্রখণ্ড দেখা গিয়েছিল, পোকা কিছু অংশ খেয়েছে কিন্তু বাকি অংশ খেয়ে শেষ করার আগেই আর্দ্রতার অভাবে তারা মরে শেষ হয়ে গেছে।

ইজিপটোলজিস্টরা শুনেছিলেন যে পিরামিড বা বাইরের ধ্বংসস্তূপগুলি নাকি অভিশপ্ত, ওগুলি স্পর্শ করা বিপদ, মৃত্যু নাকি অবধারিত। বাইরে কোনো কোনো প্রস্তরে নাকি প্রাচীন আরবী ভাষায় এমন লেখা দেখা গিয়েছিল : ডেথ উইল কাম অন সুইফট উইংস টু হিম হু এনটারস দিস টুম্ব।

১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইজিপটোলজিস্টরা টুটানখামেনের কবরঘরে প্রবেশ করেছিলেন আর ছ' সপ্তাহ পরে ৫ এপ্রিল তারিখে লর্ড কারনারভন মারা গেলেন। তাঁর মুখে বুঝি একটা মশা কামড়েছিল। বয়স হয়েছিল তেষট্টি। মৃত্যুটা অকালে নয় তবে হঠাৎ বলা যায়।

লর্ড কারনারভনের মৃত্যুসংবাদ শুনে সারা পৃথিবীতে অনেক লোক বিশ্বাস করলো টুটানখামেনের মমির অভিশাপেই কারনারভনের মৃত্যু হয়েছে। টুটানখামেনের আত্মা বা 'কা' আজও পিরামিডের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আত্মা নিশ্চয় প্রতিহিংসা নিয়েছে।

টুটানখামেন সেই কবে কোন্ শতাব্দীতে মরে গেছে, তার আত্মা আজও কি তার ব্যবহার্য সামগ্রীগুলি আগলে বেড়াচ্ছে এবং সেগুলি যে স্পর্শ করছে তাকেই তার অভিশাপ আঘাত করছে? ফলে মৃত্যু! এই বিংশ শতাব্দীতেও তা সক্রিয়? কারনারভন একা নয়, পর পর আরও কয়েক–

জন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলো।

লর্ড কারনারভন নাকি পিরামিডের ভেতরে প্রাপ্ত অ্যালাবাস্টারের তৈরি একটি 'ফুলদানির' ভেতর হাত ঢুকিয়েছিলেন। ফুলদানিটি মূল কবরখানার ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল। ফুলদানির গায়ে বুঝি লেখা ছিল 'মহান ফারাও-এর কবর যে স্পর্শ করবে মৃত্যু তাকে দ্রুত আঘাত করবে'। সেই ফুলদানির ভেতর থেকে লর্ড কারনারভন যখন তাঁর হাত বার করে নিলেন তখন তাঁর একটি আঙুলে রক্তের একটি বিন্দু দেখা গিয়েছিল। কীট বা মশা দংশন কবলো নাকি? যে কুড়িজন ইজিপটোলজিস্ট ১৯২৩ সালের সেই ১৭ ফেবরুয়ারি তারিখে টুটান-খামেনের পিরামিডে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের মনে পড়লো সেদিন আবহাওয়া ছিল স্থির, স্তব্ধ, বাতাসের লেশ ছিল না, বলতে কি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন, কিন্তু তাঁদের দলটি যেই পিরামিডের ভেতরে ঢোকবার জন্যে কয়েক ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করলেন আর অমনি বাইরে মৃদু ঘুর্ণিঝড় উঠে বালিতে বাতাস আচ্ছন্ন করলো। সেই ঘুর্ণিঝড় ঘুরতে ঘুরতে সমস্ত পিরামিডটাই ঘুরে এসে বাতাসেই বিলীন হয়ে গেল। কোথা থেকে একটা বাজপাখি উড়ে এসে পিরামিডের ওপর চক্কর দিতে দিতে পশ্চিম দিকে চলে গেল। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর সব আত্মা পশ্চিম দিকেই যায়। উল্লেখযোগ্য যে বাজপাখি হলো মিশরীয় রাজবংশের প্রতীক।

ফারাও-এর অভিশাপ বুঝি লর্ড কারনারভনকে শেষ করে নিরস্ত হলো না। পাঁচ মাসের মধ্যে লর্ড কারনারভনের সৎ ভাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য অব্রে হারবার্ট রহস্যজনকভাবে অজ্ঞাত কারণে মারা গেলেন। রহস্যজনক? তিনি তো তীব্র পেরিটোনাইটিসে মারা গিয়েছিলেন। পেরিটোনাইটিস হতে যাবে কেন? এ রোগ হবার কারণ কি? নানা প্রশ্ন। ছ'বছর পরে ১৯২৯ সালের ফেবরুয়ারিতে লর্ড কারনারভনের বিমাতা মারা গেলেন। একটা পোকার দংশনের ফলে নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কি সেই বিষাক্ত পোকা?

আরও কয়েকজনের মৃত্যু হলো যাঁরা পিরামিডে প্রবেশ করেছিলেন বা টুটানখামেনের কবরে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলির সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোটিপতি উলফ জোল ঐ সময়ে তাঁর ইয়টে চেপে নীল নদে প্রমোদভ্রমণ করছিলেন। একদিন সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেলেন, স্ট্রোক হলো এবং তিনি মারা গেলেন। তাঁর কোটি কোটি মুদ্রা তাঁকে বাঁচাতে পারলো না।

আমেরিকার একজন ধনকুবের, রেল কোম্পানির মালিক জর্জ জে. গুল্ড ১৯২৩ সালের ১৬ মে তারিখে মারা গেলেন। তিনি পিরামিডে প্রবেশ করেছিলেন। কায়রোয় থাকবার সময় ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়, সর্দি থেকে নিউমোনিয়া। তখনও সালফা ড্রাগ বা পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয় নি। প্রচলিত ওষুধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা তাঁকে বাঁচাতে পারে নি।

দু'জন মিশরীয় যাঁরা ফারাওদের বংশধর বলে নিজেদের দাবি করেন তাঁদের একজনের নাম প্রিন্স আলি ফাহ্‌মি এবং অপরজন তাঁর ভাই যাঁর নাম হাল্লা বে, এঁরা দু'জনেই অভাবনীয়ভাবে মারা যায়। লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে আলি ফাহ্‌মি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয় আর হাল্লা বে আত্মহত্যা করেন।

ইজিপশিয়ান আর্মির সর্দার স্যার লি স্ট্যাক ১৯২৪ সালে নিহত হন আর ১৯৩৪ সালের ৯ মার্চ তারিখে মার্কিন লেখক লুই কে সিগিন্স হঠাৎ মারা গেলেন। উপরোক্ত রহস্যজনক মৃত্যুগুলি অবলম্বন করে তিনি একখানি নাটক লিখেছিলেন।

আরও কয়েকজন নাকি রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। এঁরা সকলেই ঐ মিশরীয় মমির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ক্যানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার-সিটির প্রফেসর লাফ্লুর ১৯২৪ সালের ৯ ফেবরুয়ারি তারিখে মারা গেলেন। আর কয়েক মাস পরে মারা গেলেন একজন নবীন ইংরেজ ইজিপটো-লজিস্ট, যাঁর নাম এইচ ই ইভলিন-হোয়াইট। তিনি আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে রেখেছিলেন, 'আই নিউ দেয়ার ওয়াজ এ কার্স

অন মি' ; আমি যে অভিশপ্ত তা আমি জানতুম।

ইভলিন-হোয়াইটের পর মারা গেল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন সাইন-রাইটার। টুটানখামেনের কবরের অনেকগুলি সামগ্রী তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল, লেবেল লিখতে হয়েছিল।

টুটানখামেনের মৃতদেহ এক্স-রে করবার জন্যে স্যার আর্চিবল্ড ডগলাস-রিডকে ভার দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে তিপান্ন বৎসর বয়সে সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রাংক র‍্যালে একজন খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার। টুটানখামেনের কবরঘরে ঢুকে সে ফটো তুলেছিল। বেচারী অন্ধ হয়ে যায় এবং ভগ্নহৃদয়ে মারা যায়।

দু'বছর পরে দু'জন ফরাসী ইজিপটোলজিস্ট যাঁরা ১৯২৩ সালের ফেবরুয়ারি মাসে ঐ কুড়িজন ইজিপটোলজিস্টের সঙ্গে পিরামিডে টুটানখামেনের কবরঘরে প্রবেশ করেছিল, ডঃ জর্জেস বেনেডাইট এবং ডঃ পাসানোভা অকালে মারা গেলেন।

ফারাওর প্রতিশোধ এখনও শেষ হয় নি, ক্ষুধা তার মেটে নি। ১৯২৯ সালে ১৫ নভেম্বর তারিখে অনারেবল রিচার্ড বিটেল মারা গেলেন। মরবার বয়স হয় নি। বিটেল ছিল হাওয়ার্ড কার্টারের সহকারী। টুটান-খামেনের কিছু সামগ্রী তার বাড়িতে কিছুদিন রাখা ছিল। সেই সময়ে তার বাড়িতে আগুন লেগেছিল। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি।

বিটেলের বাবা লর্ড ওয়েস্টবেরি বৃদ্ধ হয়েছেন। মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলতেন, 'দি কার্স অফ দি ফারাও', এসবই ফারাও-এর অভিশাপ। তিনি তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এই বিভীষিকা আমি আর সহ্য করতে পারছি না এবং আমি এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি চাই'। লর্ড ওয়েস্টবেরি লণ্ডনে তাঁর বাড়ির জানালা থেকে নিচে ফুটপাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

লর্ড ওয়েস্টবেরির বয়স তখন আটাত্তর। তাঁর বাড়িতে অ্যালাবাস্টারের তৈরি সেই ফুলদানিটি পাওয়া গিয়েছিল যার ভেতর লর্ড কারনারভন হাত

ঢুকিয়েছিলেন। ফুলদানিটি বাড়িতে এনেছিল তার ছেলে রিচার্ড বিটেল। পাঁচদিন পরে কবর দেবার জন্যে লর্ড ওয়েস্টবেরির কফিন একটি গাড়িতে চাপিয়ে যখন গোল্ডার্স গ্রীনের কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সেই গাড়িতে ধাক্কা লেগে আট বৎসরের বালক যোসেফ গ্রীয়ার মারা যায়। দু'বছরের মধ্যে রিচার্ড বিটেলের স্ত্রীও মারা যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেডি ওয়েস্টবেরির পাটনি পাড়ার বাড়িতে জার্মানদের বোমারু বিমান থেকে বোমা পড়েছিল।

আরও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে মারা যায়। প্রফেসর অ্যালবার্ট লিথগো এবং প্রফেসর এ সি মেস, দু'জনেই খ্যাতনামা ইজিপটোলজিস্ট, দু'জনেই আকস্মিকভাবে মারা যায়। তারপরই মারা গেল ইজিপশিয়ান অ্যান্টিকুইটিজের ইনস্পেক্টর আর্থার উইগল এক অজানা জ্বরের আক্রমণে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ যাঁরা মারা গেলেন তাঁরা যদি কোনোভাবে টুটানখামেনের কবরের সঙ্গে জড়িত হয়ে না পড়তেন তাহলে কি তাঁরা মারা যেতেন না?

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জেমস ব্রেস্টেড ফারাওদের কবরের খননকাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে ৩ ডিসেম্বর তারিখে মারা যান সত্তর বৎসর বয়সে। স্ট্রেপটোকক্কাই জীবাণুর আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রফেসর ব্রেস্টেড বলতেন "আমি ওসব অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস করি না। আমি তো দু'সপ্তাহ পিরামিডের ভেতরে ঐ কবরখানায় ছিলুম, ওখানেই খেয়েছি, ঘুমিয়েছি আর বলতে কি ঐ দুই সপ্তাহ আমার স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল, এত ভালো আর কখনও ছিল না।"

ইজিপটোলজির জনক স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি মারা গিয়েছিলেন উননব্বুই বছর বয়সে। তারপর টুটানখামেনের কবরঘরে প্রাপ্ত সামগ্রী নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন দু'জন ব্যক্তি, স্যার এডওয়ার্ড এ ওয়ালিস বাজ মারা গিয়েছিলেন উনআশি বছর বয়সে এবং প্রফেসর পি ই নিউবেরি

মারা গিয়েছেন আশি বছর বয়সে। প্রফেসর বাজ বলেছেন, আমি তো অনেক দেশেই মমি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি কিন্তু কারও শাপ আমাকে লাগে নি।

টুটানখামেনের কবর আবিষ্কারের ব্যাপারে হাওয়ার্ড কার্টারের নাম তখন সর্বাধিক পরিচিত। কবর আবিষ্কারের পর তিনি সতেরো বছর বেঁচে ছিলেন, ১৯৩৯ সালের ২ মার্চ সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি মারা যান। অভিশাপ তো তারই আগে লাগা উচিত ছিল।

যদিও দুই পক্ষের ব্যক্তির নিজ মত সমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে তবুও শেষোক্ত ব্যক্তিগুলির মৃত্যু সম্বন্ধে বলা যায় যে ওঁরা কেউ মমির অভিশাপের শিকার নয় কারণ ওঁরা সকলেই পরিণত বয়সেই মারা গেছেন।

একদল ব্যক্তি বলেন যে মমিদের দেহে বা কবরের মধ্যে তীব্র কোনো জীবাণু আছে যার সংক্রমণে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কোনো কবরখানায় কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি। জীবাণুদের বাঁচার জন্যে কিছু পরিমাণ আর্দ্রতার অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু পিরামিডগুলির অভ্যন্তর একেবারে খটখটে শুকনো, আর্দ্রতা একেবারেই নেই। এমন কি চামড়ার দ্রব্যের ওপর কোথাও ছাতা পড়ে নি।

বলা হয়েছে যে মশার কামড়ে লর্ড কারনারভনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু 'ভ্যালি অফ দি কিংস' অঞ্চল এতোই শুষ্ক ও নির্জলা যে সেখানে মশা নেই। লর্ডকে মশা কামড়েছিল ঠিকই কিন্তু সে মশা পিরামিডের কাছে কামড়ায় নি, অন্যত্র, লুকসর নামে এক জায়গায় তবে পিরামিডের অনতিদূরে।

ফারাওদের যদি কোনো অভিশাপ থাকবে তাহলে যারা দস্যুবৃত্তি করতো, যারা চোরাপথে পিরামিডের ভেতরে ঢুকে কোনো কিছু সামগ্রী চুরি করে আনতো তাদের কারও কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয় নি। এবিষয়ে তদন্তও করা হয়েছিল। এমন কোনো অভিশাপ যদি আরোপিত থাকতো তাহলে দস্যুদের হাত থেকে পবিত্র পিরামিডের অভ্যন্তরস্থ সম্পদ-রক্ষার জন্যে প্রাচীন মিশরের ধর্মীয় নেতারা তা নিশ্চয় প্রচার করতেন।

ফারাওদের পুরোহিতরাও কোনোরকম অভিশাপ সম্বন্ধে নীরব।
টুটানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হওয়ার পর যে বিশ তিরিশ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তারা কেউ ফারাওদের আরোপিত অভিশাপে মারা যায় নি। কতকগুলি কাকতালীয়বৎ ঘটনাই তাদের মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে অভিহিত করেছে। যথাযথভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সব ক'টি মৃত্যুই স্বাভাবিক।
তবুও কথা আছে। সব কিছুই হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যারা বিশ্বাস করেন মমির অভিশাপ আছে এবং আজও বুঝি তা সক্রিয় তাদেরও কিছু বলার আছে।

টুটানখামেনের কবরে যে অভিশাপ আছে তার তো লিখিত একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই যে ফুলদানিটা যার ভেতরে লর্ড কার্নারভন হাত ঢুকিয়েছিলেন তার গায়ে তো লেখা ছিল, সাবধান, মহান ফারাও-এর কবর যে স্পর্শ করবে, মৃত্যু তাকে পলকে আঘাত হানবে। এই ফুলদানিটা পুত্র রিচার্ড বিটেলের হাত ঘুরে পিতা লর্ড ওয়েস্টবেরির শো-কেসে পৌঁছেছিল। প্রথমে সেই বাড়িতে রহস্যজনকভাবে হঠাৎ আগুন লেগেছিল যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি, তারপর তো লর্ড ওয়েস্টবেরি একদিন জানালা টপকে রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে স্বয়ং মৃত্যু বরণ করলেন।
অলৌকিক ঘটনা বা অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা নাকি বলেন যে কোনো অভিশাপ কার্যকরী করতে হলে যে কোথাও তা লিখে রাখতে হবে তার কোনো মানে নেই। মুখে উচ্চারণ করলেও তা কার্যকরী হয়। মনের সূক্ষ্ম স্তরের আবরণে অভিশাপ কার্যকরী হয়। আমরা হিন্দুরাও শাপমুক্তিতে বিশ্বাস করি, ভয়ও করি পাছে কেউ শাপ দেয়। কত সময়ে অভিশাপ ফলেও যায়, তবে সেটা কাকতালীয়বৎ ঘটনা কি না বলতে পারি না।
প্রাচীন মিশরীয় পুঁথিতে অভিশাপ দেওয়ার কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে।

অনেক প্রাচীন কবরের গায়ে অভিশাপ উৎকীর্ণ আছে। মিশরের প্রাচীন পুঁথি পড়ে জানা যায় কি করে তারা পিরামিডে বা ফারাওর সমাধিতে অভিশপ্ত আত্মা ছেড়ে দিতো।

ফারাওর কোনো বলশালী এবং বিশ্বস্ত ক্রীতদাসকে বেছে নেওয়া হতো তারপর তার ওপর ধীরে ধীরে কিন্তু নিয়ম করে নিরন্তব অত্যাচার চালানো হতো যে পর্যন্ত সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যেতো। অত্যাচার চলাকালীন সময়ে তার কানে মন্ত্র পড়া হতো 'মৃত্যুর পরও তুমি তোমার ফারাওকে পাহারা দেবে. রক্ষা করবে'। এইভাবে তার মগজ ধোলাই করা হতো এবং যখন তা সম্পূর্ণ হতো তখন তাকে মেরে ফেলা হতো। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো ক্রীতদাসের সেই আত্মা তার মৃত প্রভু ফারাও ও তার সম্পদসমূহ রক্ষা করছে অনন্তকাল ধরে। অত্যাচার-পীড়িত ক্রীতদাসের আত্মা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং তার প্রভুর মমি বা কোনো সামগ্রী স্পর্শ করলে তাকে হত্যা করবেই বা কোনো ক্ষতিসাধন করবে।

কিছু কিছু লিখিত অভিশাপের সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন ফারাও প্রথম সেটির সমাধিতে লেখা ছিল "যে আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবে তার ওপর আমার মুকুটের গোখরো সাপ আগুন ছড়িয়ে দেবে ··"

আর একটি কবরে লেখা ছিল "যে কেউ আমার কবরে প্রবেশ করবে, পাখিব ওপর হিংস্র পশু যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিও সেইভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং তারপর মহান ঈশ্বর তার বিচার করবেন···।"

আরও একটি, "যদি কেউ আমার কবরের ক্ষতি করে বা আমার মমি স্থানচ্যুত করে তাহলে সূর্যদেব তাকে শাস্তি দেবেন···।"

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে এই অভিশাপগুলি হলো চোর বা দস্যুদের ভয় দেখাবার জন্যে। কিন্তু চোর-ডাকাতরা এতে ভয় পাবার মানুষ নয়। নবম রামোসিসের রাজত্বকালে অ্যাবট প্যাপিরাসে লিখছেন যে পিরামিড ও সমাধিভূমি থেকে চোর-ডাকাত তাড়াবার জন্যে আরক্ষাবাহিনী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল টুটানখামেনের দু'শো বছর পরে।

মমির অভিশাপে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেছেন যে টুটানখামেনের কবর নিশ্চিতভাবেই অভিশপ্ত। মিশরের ইতিহাসে এমন সাড়ম্বরে কাউকে কবর দেওয়া হয় নি। কেন? কারণ কি? হাওয়ার্ড কার্টার বলেছেন যে মরে যাওয়া এবং কবরস্থ হওয়া ছাড়া টুটানখামেনের জীবনে উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটে নি। তাহলে টুটানখামেনের কবর অভিশপ্ত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো পরে পাওয়া যাবে।

লর্ড কারনারভনের পৃষ্ঠপোষকতায় হাওয়ার্ড কার্টার ষোলো বছর ধরে 'ভ্যালি অফ দি কিংস' অঞ্চলে টুটানখামেনেব কবর খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁরা জানতেন এই অঞ্চলে টুটানেব কবর আছে। টুটানকে কবর দেবার জন্যে যে বিরাট উদ্যোগ-আয়োজন করা হয়েছিল তার অনেক নিদর্শন পিরামিডের বাইরে পাওয়া গিয়েছিল এবং ঐসব নিদর্শনেই টুটানখা-মেনের নাম পাওয়া গিয়েছিল।

রাজার কবর অনুসন্ধান ও খননকাজ চালাবার জন্যে হাওয়ার্ড কার্টার মিশর সরকাবের অনুমতি বা 'পারমিট' সংগ্রহ করেছিল এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। পারমিটের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছে এবং সময় উত্তীর্ণ হতে আর মাত্র চারদিন বাকি আছে সেই সময়ে কার্টার কবরখানার ধাপ আবিষ্কার করে।

কার্টার সঙ্গে সঙ্গে কারনারভনকে লণ্ডনে টেলিগ্রাম করে। কারনারভনও তৎক্ষণাৎ কন্যা ইভলিনকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ওঠে। সকন্যা লর্ড পিরা-মিডে পৌঁছে কি হলো তা আগেই বলা হয়েছে।

সোনার তৈরি আসবাব দেখে তো তাঁরা অবাক এবং সেই ক্ষণ থেকেই ঘটনার আরম্ভ। অমন একটা কবরখানা সমীক্ষা করতে সময় লাগে। পুরাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে অনেক কিছু করণীয় আছে, অনেক মাপজোপ, দীর্ঘ তালিকা, অজস্র ফটোগ্রাফ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সেগুলি অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরাবার প্রশ্ন আছে।

এইসব প্রাথমিক কাজ যখন করা হচ্ছিল তখন লর্ড কারনারভন মেয়েকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেলেন।

অত্যাশ্চর্য এই কাহিনী লণ্ডনের 'টাইমস' প্রমুখ সমস্ত খবরের কাগজেই ফলাও করে ছাপা হলো। কাউন্ট লুই হ্যামন যাকে আমরা ভবিষ্যৎবক্তা 'কিরো' নামে চিনি তিনিও এই কাহিনী পড়লেন। সেইদিন বিকেলেই তাঁর একজন সহকারী, একটি মিশরীয় যুবতী কিরোর সঙ্গে দেখা করতে এসে পিরামিডের এই আশ্চর্য কাহিনী শুনল। যুবতী যেহেতু মিশরের অতএব পিরামিড সম্বন্ধে তার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিরো নানা বিষয়ে অদ্ভুত সব ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। নতুন আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন এই আশায় যুবতী একটি লেখবার প্যাড ও পেনসিল কিরোর সামনে রেখে দিলো। কিরো ভাবাবিষ্ট হয়ে প্যাডের ওপর লিখলো :

লর্ড কারনারভন যেন পিরামিডে প্রবেশ না করেন। যদি প্রবেশ করেন তাহলে তিনি রোগাক্রান্ত হবেন এবং ইজিপটেই মারা যাবেন।

এই কথা জানিয়ে কিরো নিজেও লর্ডকে একখানা চিঠি লিখলেন। কিরোর কথা লর্ড বোধহয় বিশ্বাস করলেন না অথবা এইসব ভবিষ্যৎবাণীতে তার বোধহয় বিশ্বাস ছিল না। তবুও লর্ডের নিজস্ব একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিল, তার নাম ভেলমা। ভেলমার সঙ্গে তখন লর্ড পরামর্শ করলেন। কিরোর মতোই ভেলমাও লর্ডকে সতর্ক করে দিল, বললো, আপনার সামনে সমূহ বিপদ।

দু'জন খ্যাতনামা জ্যোতিষী তাঁকে সতর্ক করে দিল। লর্ড চিন্তিত হয়ে পড়লো কিন্তু তাঁকে তো মিশরে যেতেই হবে তাই তিনি জাহাজে ওঠবার আগে আর একবার ভেলমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ভেলমা এবার ক্রিস্টাল বলের সামনে বসলো। এই স্ফটিক গোলকে নাকি ভেলমারা সিনেমার ছবির মতো ব্যক্তিবিশেষের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায়।

ভেলমা বললো স্ফটিক গোলকে সে মিশরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে একটা মন্দির, শোকাকুল ব্যক্তিদের শোভাযাত্রা, একজন বৃদ্ধ পুরোহিত একটি মমির মুখে সোনার মুখোশ পরাচ্ছে। সমাধি দেখতে পাচ্ছে, পাশে লর্ড কারনারভন দাঁড়িয়ে আছেন। সমাধি থেকে বিদ্যুৎপ্রভা

বেরিয়ে একা লর্ডকে আবৃত করছে, আর কাউকে নয়। ভেলমা বললো: আমি দেখছি আপনার সর্বনাশ আসন্ন, পরিকল্পনা ত্যাগ করুন।
কারনারভন স্বীকার করলেন তিনি তাঁর মনের ওপর কিসের একটা তীব্র ও অদ্ভুত প্রভাব অনুভব করছেন, কে যেন তাকে বলছে আর এগিয়ো না। মানসিক দুর্বলতা মনে করে তিনি এই মনোভাব ঝেড়ে ফেললেন এবং মেয়েকে নিয়ে ইজিপ্ট যাবার জন্যে জাহাজে উঠলেন। মেয়েকে কিছু বলেন নি। রাত্রে কেবিনে শুয়ে যখন ঘুম আসে না তখন তাজা হাওয়ার জন্যে জাহাজের ডেকে উঠে আসেন। অন্ধকার ডেকে একা পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, কি ভাবেন। হয়তো ভাবেন মেয়েটাকে সঙ্গে না আনলেই হতো।
সব দুর্বলতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে লর্ড কারনাবভন পিরামিডে হাজির হলেন। শত শত দর্শক ও সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের সমক্ষে তিনি হাওয়ার্ড কার্টারের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে ঢোকবার সময় তাঁর কানে এলো, কে যেন, বোধহয় একজন সাংবাদিক মন্তব্য করলো: "খুব যে মেজাজ! কিন্তু ছ'সপ্তাহের বেশি পরমায়ু নেই⋯"
কারনারভন গ্রাহ্য করলেন না, ফিরেও চাইলেন না। সেদিন অবশ্য কোনো ঘটনা ঘটলো না।
কয়েকদিন পরে কারনারভন যখন পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন একটা মশা তাঁর গালে দংশন করলো অথচ ওখানে মশা থাকা অসম্ভব, কোথাও জল নেই, বায়ু শুষ্ক, মশা জন্মাবে কি করে? তবুও তো কোথা থেকে একটা মশা এসে ওঁকে কামড়ালো। শহর থেকে কারও বা তাঁরই পোশাকের সঙ্গে এসে গিয়েছিল নাকি? যে ভাবেই এসে থাকুক, মশাটি আর কাউকে নয়, লর্ড কারনারভনকেই দংশন করলো।
লর্ড কারনারভন ফুলদানিতে হাত ঢুকিয়েছিলেন। তাঁর আঙুলে একটা মশা বা কোনো কীট দংশন করেছিল। সেই দংশনই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এমন কাহিনীও প্রচলিত আছে।
পরদিন সকালে দাড়ি কামাবার সময় মশাটা যেখানে কামড়েছিল

সেইখানটা লর্ড তাঁর ক্ষুরে কেটে ফেললেন। তখন তো ডেটল ছিল না তাই দাড়ি কামাবার পর কাটা জায়গায় তিনি তুলো দিয়ে টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে দিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাতেই তাঁর জ্বর এলো, শীত শীত করতে লাগলো, টেম্পারেচার উঠলো ১০১ ডিগ্রি।

লর্ড কারনারভন শুয়ে পড়লেন। দশ দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না, কোনো একটা রোগ সংক্রামিত হয়েছে। সেই রোগ দাঁড়ালো নিউ-মোনিয়াতে এবং তাঁর মৃত্যু হলো।

কিন্তু মশা ও কীটের দংশনে কি নিউমোনিয়া হয়? দংশনটা কি কাক-তালীয়বৎ ঘটনা নয়?

ঠিক যে সময়ে লর্ড কারনারভন মারা গেলেন ঠিক সেই সময়ে কায়রো শহরের সমস্ত ইলেকট্রিক আলো পাঁচ মিনিটের জন্যে নিবে গিয়েছিল। অথচ কায়রো ইলেকট্রিসিটি বোর্ড দেখেছিল তাদের সমস্ত ফিউজ এবং সার্কিট ব্রেকারগুলি অটুট ছিল। আলো নিবে যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

টুটানের কবর আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২২ সালে, কিন্তু তাঁর কফিন খোলা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। কফিন খোলার পর দেখা গিয়েছিল টুটানের মুখ একটি সোনার মুখোশে ঢাকা। মুখোশটি কি রকম? ঠিক যেমনটি ভেলমা তার স্ফটিক গোলকে দেখেছিল!

যেরকম জাঁকজমক ও আড়ম্বর সহযোগে ও ব্যবহারযোগ্য মূল্যবান সামগ্রী সাজিয়ে টুটানখামেনকে কবর দেওয়া হয়েছিল অমনভাবে মিশরের আর কোনো রাজাকে কবর দেওয়া হয় নি। কারণটা কি?

কারণ কি বলতে গেলে এর পশ্চাতে অত্যন্ত নোংরা, পংকিল ও ক্লেদপূর্ণ কাহিনী বিশ্বাস করে নিতে হবে। অবিশ্বাস্য হলেও ইতিহাসে তার স্বাক্ষর আছে। অতএব বিশ্বাস করুন আর নাই করুন টুটানখামেনের কাহিনী মেনে নিতে হবে। আর এই সঙ্গে টুটানখামেনের কবরের সঙ্গে জড়িত অভিশাপেরও একটা উত্তর পাওয়া যাবে।

সে অনেক দিন আগের কথা। ফারাও তৃতীয় আমেনোফিস যখন মিতান্নি সাম্রাজ্যের রাজকন্যা টিয়কে বিয়ে কবেন তাবও পঞ্চাশ বছর আগে ঘটনাব সূত্রপাত। আমেনোফিসের ঠাকুর্দা তৃতীয় থুটমোস বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়েব পুবোহিতদের এক উচ্চ কোটির পৌবোহিত্যের অধীনে আনেনে। এই নতুন ব্যবস্থাকে তিনি 'আমন' নামে অভিহিত করেন। আমন পৌবোহিত্যেব স্থান হলো সর্বোচ্চ এবং এই সর্বোচ্চ আসনটি দেওয়া হলো আমেনোফিসকে যাব ফলে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার অধিকাব ও ক্ষমতা আমেনোফিস লাভ করলো।

রাজ্য পরিচালনায় নানা ব্যাপারে শেষ ভবিষ্যদ্বাণীটি উচ্চারণ করতেন এই ফারাও। বানী টিয় যখন একটি পুত্রসন্তান প্রসব কবলেন তখন সেই শিশু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হলো যে শিশুটিকে বাজত্বের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে প্রতিপালন করতে হবে এবং প্রতিপালনের কাজটি বাবাকেই করতে হবে। শিশুটিকে সম্ভবত তাব মামাব বাড়ি মিতান্নি বাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শিশুটিব নাম জানা যায় নি। বাবার মৃত্যুব পর সে ইজিপ্টে ফিরে এসে সিংহাসনে বসে। সিংহাসনে বসে নতুন ধর্মীয় রীতি প্রচলন নিয়ে আমন পুরোহিতদের সঙ্গে তার বিবাদ আরম্ভ হয়। আমন পুরোহিতই তো তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল।

নতুন ফারাও তার রাজধানী থিব্‌স থেকে উঠিয়ে উত্তরে নিয়ে গেল। নতুন রাজধানীর নাম হলো আখেত-আটন। সে তার নাম থেকে 'আমন' শব্দটিই বাদ দিয়ে নতুন নাম নিল আখনাটন।

ইতিহাসে আখনাটন মানবদরদী ও বীররাজা বলে পরিচিত। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির অনেক সংস্কার করেন এবং সকল দেবদেবীকে বিসর্জন দিয়ে একটিমাত্র দেবতাকে আরাধনা করবার নির্দেশ দেন, সেই দেবতার নাম 'আটন'। তিনি কবি ও শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন, নতুন ধরনের শিল্পকলারও প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি শিল্পকলা, কাব্য ও ধর্ম-

সংস্কার নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। ছবি এতো ভালোবাসতেন যে পরিবারের সকলের অনেক ছবি আঁকিয়েছিলেন তবে সকলেই নগ্ন। তিনি নিজেও তাঁর নিরাবরণ দেহ দেখাতে ভালোবাসতেন।

এই সকল শৌখিন কাজে তিনি তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করতেন ফলে দৈনন্দিন রাজকার্য অবহেলিত হতো। ভিন্ন প্রদেশের শাসকেরা তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে এসে বিফল হয়ে ফিরে যেতেন।

আখনাটনের রানীর নাম নেফারতিতি। তিনি ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুন্দরী। নেফারতিতির একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি আজও শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের প্রশংসা অর্জন করে। নেফারতিতি, নিজের পরিবার ও শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আখনাটন এতো ব্যস্ত থাকতেন যে বারো বছরের মধ্যেই রাজ্যশাসনে বিশৃংখলা দেখা দিলো। সব ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

আখানাটনকে নেফারতিতি ছটি কন্যাসন্তান উপহার দিয়েছিল। কিন্তু নেফারতিতির আরও একটি কন্যা ছিল। এই সপ্তম কন্যাটি থাকতো তার দিদিমা রানী টিয়র কাছে। এই কন্যার পিতা অবশ্যই আখনাটন কিন্তু মা কে? সপ্তম কন্যার মাতৃত্ব নিয়ে পুরাতত্ত্ববিদরা অনেক গবেষণা করেছেন।

গবেষকরা স্থির করেছেন যে আখনাটন তার নিজের মাতৃগর্ভে এই সপ্তম কন্যার জন্ম দিয়েছে। এই কন্যা তার নিজের কন্যাও বটে আবার ভগিনীও। আখনাটন যখন কলা ও কাব্য নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত তখন শাসনভার গ্রহণ করেছিল তার মা টিয় এবং প্রধানা মহিষীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা টিয়কেই দেওয়া হয়েছিল। নেফারতিতি রানী কিন্তু পাটরানী নয়। পাটরানী হলো তার শাশুড়ী টিয়। বলতে গেলে টিয় আবার ছেলেরও রানী।

সভ্যতার আদিপর্বে আর্যদের মধ্যে তখন মাতা-পুত্র পিতা-কন্যা বা ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে যৌন-সংসর্গ প্রচলিত ছিল। মিতান্নি রাজ্যে, যেখানে আখনাটন প্রতিপালিত হয়েছিল সেখানেও এই রীতি এতদিন পরেও প্রচলিত ছিল কিন্তু মিশরে তখনও এই রীতি নিন্দনীয় ছিল। এই রীতি

মিশরে চালু করলো আখনাটন। মিশরে সহোদর ভাই-বোনে বিবাহ দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল।

এবার মঞ্চে অবতীর্ণ হ'লো দু'জন রাজকুমার, স্মেনকেয়ার এবং টুটানখামেন। এদের মা যে কে ছিলেন তা জানা যায় না তবে অনুমান করে নেওয়া যায়। দু'জনেরই পিতা কিন্তু আখনাটন, সে বিষয়ে গবেষকরা একমত। দুই রাজকুমারের চেহারা দেখে ধরা হয়েছে যে স্মেনকেয়ার হলো নেফারতিতির ছেলে এবং টুটানখামেন হলো টিয়র ছেলে।

এই দুই ভাইয়ের বিয়ে হয় তখন নেফারতিতির দুই মেয়ের সঙ্গে অর্থাৎ নিজেদের বোনের সঙ্গে। স্মেনকেয়ারের বিয়ে হয় মেরিতাতেনের সঙ্গে আর টুটানখামেনের বিয়ে হয় আনখেসেনপাতনের সঙ্গে। আনখেসেন-পাতনের কুমারি অবস্থায় একটি সন্তান হয়েছিল, সেই সন্তানের পিতা তার নিজের পিতা আখনাটন।

বিয়ের পর স্মেনকেয়ারকে সহ-শাসক নিযুক্ত করলো আখনাটন এবং পিতা-পুত্রে এক পংকিল জীবনে ডুবে গেল।

যদিও ইতিহাস পড়ে সঠিকভাবে জানা যায়না তবে মনেহয় এই সময়ে মিশর ঘোর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। বেকার সমস্যা ব্যাপক, দেশে অর্থের আমদানী নেই, শত্রুরা সীমান্ত অতিক্রম করছে। রাজা নিজেও পাপে ডুবে আছে। মিশরের ওপর বুঝি ক্রমশ দেবতার অভিশাপ নেমে আসছে।

মিতান্নিতে প্রচলিত পুত্র/মাতা, পিতা/কন্যা সহবাস মিশরে ঘৃণিত। মিশর তা মেনেও নিল না ফলে আখনাটনকে সিংহাসন ছাড়তে হলো, টিয় আত্মহত্যা করলো এবং নেফারতিতি কোথায় হারিয়ে গেল। এদের কারও মমি কোনোদিন পাওয়া যায় নি।

টিয়র মৃত্যু এবং আখনাটন সম্ভবতঃ নির্বাসনে, এই অবস্থায় স্মেনকেয়ার সিংহাসনে বসলো। আগেই তো সে সহ-শাসক ছিল এখন পাকাপাকিভাবে সিংহাসন অধিকার করলো। টিয়র ভাই আই হলো সর্বোচ্চ পুরোহিত। রাজাকে আই পরামর্শ দিলো, তুমি এবার অভিযানে বেরিয়ে পড়, যেসব

প্রদেশের সীমা শত্রুরা লঙ্ঘন করেছে সেই সব প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করে দেশকে আবার শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

ভালো পরামর্শ, স্মেনকেয়ার অভিযানে বেরিয়ে পড়লো (এবং সে আর ফিরে আসে নি) আর এই সুযোগে আই তার বারো বছরের ভাগ্নে টুটান-খামেনকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। বারো বছরের ছেলে কি আর দেশ শাসন করবে ? দেশ শাসনের সে কিই বা বোঝে? অতএব মূল শক্তি রইলো মামা আই-এর হাতে, ভাগ্নে তার হাতে খেলার পুতুল।

ছ'বছর এইভাবে চললো। টুটানের বয়স যখন আঠার এবং সে যখন ব্যাপারটা একটু বুঝতে শিখছে সেই সময়েই রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হলো রাণী আনখেসেনপাতন বিধবা হলো। আই নিজেকে ফারাও ঘোষণা করলো।

আই অকৃতজ্ঞ নয়। একটি পিরামিডের অভ্যন্তরে অতি উত্তমরূপে ও জাঁকজমক সহকারে ভাগ্নেকে কবরস্থ করলো। ভাগ্নের আত্মা যাতে কষ্ট না পায়, কোনো সামগ্রীর অভাব বোধ না করে সেজন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী দিয়ে কবরঘর ভরিয়ে দিলো। বস্ত্র, আসবাব, ব্যবহার্য সামগ্রীর তুলনা হয় না, প্রতিটি অত্যন্ত দামী বাছাই করা ও সেরা। সোনার তো ছড়াছড়ি। এবং কবরঘর যে আই স্বয়ং সাজিয়ে দিয়েছে ও কোনো ত্রুটি রাখে নি সে কথাও সাড়ম্বরে কবরখানার সর্বত্র প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কেন এত আড়ম্বর ? কেনই বা বিলাসের উপকরণ এত অপর্যাপ্ত ? আর কোনো ফারাওকে তো এমনভাবে কবরস্থ করা হয় নি ? কি উত্তর ?

প্রাচীন মিশরীয়রা পরজন্মে বিশ্বাসী তাই আই খুব ভীতিগ্রস্থ। টুটানের অতৃপ্ত অশরীরি মূর্তি যদি প্রতিহিংসা নেয় ? প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সত্যালোক অতিক্রম করবার একটা যুক্তি থাকা চাই। সে যদি কোনো কারণে তৃপ্ত হয় তাহলে সে সত্যলোক অতিক্রম করে জীবিত কোনো ব্যক্তির ওপর প্রতিহিংসা নিতে পারবে না। তাই টুটানের আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে আই-এর এই বিপুল আয়োজন। টুটানের আত্মা যেন সুখে থাকে, কবরের মধ্যে সকল রকম

সুখ ও বিলাসের সামগ্রী দেখে সে যেন মামার অপরাধ ভুলে যায়। এই সঙ্গে আই কবরের ওপর একটি অভিশাপ আরোপ করতেও ভোলে নি। যদি কেউ কবরঘরে প্রবেশ করে। সামগ্রীগুলি লুটপাট করে নিয়ে যায় তাহলে তো টুটান বিরক্ত হবে অতএব এই অভিশাপ।
ঐতিহাসিকরা বলে আখনাটনের আমল থেকে মিশরে যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার জন্যে যে বিরাট পরিমাণ পাপ সৃষ্টি হয়েছিল সব জমা করে রাখা ছিল টুটানখামেনের কবরে, যে কবরের দ্বার একদিন লর্ড কারনারভন ও হাওয়ার্ড কার্টার খুলে দিলো।

কারনারভন তো ছ' সপ্তাহের মধ্যে মারা গেল অথচ হাওয়ার্ড কার্টার বেঁচে রইলো। কবর ঘেঁটেছে যারা তাদের মধ্যে আরও কেউ অকালে মারা গেল বা আত্মহত্যা করলো আবার কেউ নব্বুই বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে রইলো। কি কারণ থাকতে পারে? যারা মারা গিয়েছিল তারা কি বিশেষ কোনো দ্রব্য স্পর্শ করেছিল বলে তাদেরই শাপ লাগলো? কোনো কোনো বিজ্ঞানী শাপমুক্তি, তুকতাক বিশ্বাস করেন। বিদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকায় 'কার্স প্যাথলজি' সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়।
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী গাণিতিক পরলোকগত আড্রিয়ান ডবস্ লক্ষ করেছিলেন যে আধিদৈবিক বা সাইকিক কোনো শক্তি সাইট্রন নামে পারমাণবিক কণিকায় প্রবেশ করে। অভিশাপে বিশ্বাসী কোনো মানুষের স্নায়ুতে অভিশাপের বার্তাবাহী সাইট্রন বাসা বেঁধে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। টুটানখামেনের কবরঘরে অভিশাপ বার্তাবাহী সাইট্রন তো থাকতেই পারে এবং সেই সাইট্রন যাদের স্নায়ুতে বাসা বেঁধেছে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে।
টুটানখামেনের কবরখানায় যে আধিদৈবিক প্রভাব কাজ করছিল তার একটা প্রমাণ অন্ততঃ পাওয়া যায়। কারনারভনের মৃত্যুর তিন বছর পরে টুটানখামেনের মমির মুখের ওপর থেকে সোনার মুখোশটি তুলে নেওয়া

হয়। প্যাথলজিস্টরা কিছু পরীক্ষা করবার সময় দেখলেন টুটানের গালে ক্ষুদ্র একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে কারনারভনের গালে ঐ একই স্থানে মশকটি দংশন করেছিল যার ফলে কারনারভন মারা যায়। দংশন না নিউমোনিয়া ? কিসে মারা গেল ?

পিরামিড এক দারুণ রহস্য। পিরামিড কি উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছিল? ফারাওদের কবরখানা করবার জন্যে? এমন একটা উদ্দেশ্য হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু নানা মুনির নানা মত।

অনেকে বিশ্বাস করে যে প্রাচীন মিশরও মিশরবাসীদের ঘিরে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। মিশরের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে নাইল উপত্যকায় কোনো রহস্য নেই এবং এই নদের উপত্যকায় যারা বাস করতো তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও বাস্তববাদী ছিল। বর্তমান যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল না ; পার্থক্য যেটা ছিল সেটা হলো যুগের সুবিধা অসুবিধা।

প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা অস্পষ্ট। তারা শুধু জানে যে প্রাচীন মিশরীয়রা কয়েকটা পিরামিড তৈরি করেছিল এবং সেই পিরামিডের ভেতর কোনো ফারাও-এর সমাধি ছিল, যেখানে কোনো অভিশাপ আরোপ করা ছিল। আর শুনেছে পরে ক্লিওপেট্রা নামে এক সুন্দরী ও লাস্যময়ী নারী মিশর শাসন করেছিল।

ফারাওদের সমাধি দেবার জন্যেই পিরামিড তৈরি করা হয় নি। এক একটি পিরামিড এক একটি 'প্রফেসি', অতীত ও ভবিষ্যত পৃথিবীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে পিরামিডে। একদল পণ্ডিত তাই বলেন। পিরামিডকে গাণিতিকের চোখ দিয়ে অধ্যয়ন করলে খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্ট পরবর্তী দু'হাজার পঁয়তাল্লিশ বৎসর আট মাস পর্যন্ত দীর্ঘকালের অতীত ও ভবিষ্যত ইতিহাস পাওয়া যাবে।

লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ডেভিডসন এবং কর্নেল স্যার চার্লস্ গারনিয়ার বিশ্বাস করেন যে পিরামিড হলো 'বাইবেল ইন স্টোন'।

পিরামিড নিয়ে তাঁরা অনেক গবেষণা করেছেন, তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন, সারগর্ভ বক্তৃতাও দিয়েছেন।

এঁদের মতে বিশেষ মাপের একটি একক ভিত্তি করে পিরামিডের পাথরগুলি কাটা হয়েছিল এবং পিরামিডের ভেতরের ও বাইরের সমস্ত নির্মাণকার্যে ঐ একক অনুসরণ করা হয়েছে। এককটি হলো ব্রিটিশ ইঞ্চ অপেক্ষা সামান্য একটু বেশি। মূল এককের মাপ হলো ১·০০১১ ইঞ্চি এবং এই মাপকে বলা হয় পিরামিড ইঞ্চি। এই একক অনুসরণ করে গবেষকরা ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সন্ধান পেয়েছেন, যথা—সেমিটিক জাতি প্যালেস্টাইন কবে ছাড়লো, যীশুর কবে জন্ম হলো এবং কবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো ইত্যাদি। অন্যান্য মহাপুরুষের জন্ম, পৃথিবীর নানা সংকট, যুদ্ধ ইত্যাদি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও তারিখ নাকি পাওয়া যায়।

ছোট বড় অনেক পিরামিডের মধ্যে গির্জা (কেউ বলেন 'গিজে') ও চিয়পস পিরামিড সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। পরের পিরামিডটি ফারাও চিয়পস্ নিজের সমাধির জন্যে তৈরি করিয়েছিলেন। মিশরীয় নাম 'খুকু' কিন্তু গ্রীকরা বলতো চিয়পস্।

নীল নদে যে সময় বন্যা আসত তখন চাষী ও শ্রমিকরা বেকার হয়ে যেত। ফারাও এই সময়ে কয়েক লক্ষ চাষী ও শ্রমিককে পিরামিড নির্মাণের কাজে লাগিয়ে দিতেন। যে কোয়ারি থেকে পিরামিডের পাথর তোলা হতো সেই কোয়ারি আজও আছে।

পাথরগুলি মাপ অনুসারে কোয়ারিতেই কাটা হতো তারপর সেগুলি পিরামিড নির্মাণের স্থানে পাঠান হতো। পাথরগুলি নিয়ে যাবার জন্যে কোয়ারি থেকে পিরামিডের স্থান পর্যন্ত পাথরের মজবুত একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। সেই রাস্তা ঘসে ঘসে এমন মসৃণ করা হয়েছিল যে পাথরগুলি সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যেত। রাস্তাটি সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ, মজবুত ও মসৃণ রাখার জন্যে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত থাকত। এই রাস্তার ধ্বংসাবশেষ নাকি আজও দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, অন্যতম সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে পিরামিডের মতো ঐ রাস্তাও একটি আশ্চর্য।

নিখুঁত মাপ অনুসারে পাথরের ব্লকগুলি কাটবার জন্যে চার হাজার দক্ষ মিস্ত্রি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পিরামিড তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল বাইশ বছর। পিরামিডের অভ্যন্তরের চেম্বার ও করিডরগুলি এই সময়ের ভেতরই সম্পূর্ণ করা হয়েছিল তবে মাঝে মাঝে নকশা অদলবদল করা হতো।

স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইজিপটোলজিস্ট বলেন যে, পিরামিড তৈরির সময় প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিড ইঞ্চি ব্যতীত 'রয়েল কিউবিট' মাপ অনুসরণ করতো যা নাকি ২০·৬২ ইঞ্চির সমান। আর একজন মিশরবিদ বলেন যে, মিশরীয়রা আরও একক ব্যবহার করতো যা পঁচিশ ইঞ্চির সমান। এই সকল মাপ ভিত্তি করেই বুঝি প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিডের পাথরে পাথরে পৃথিবীর ইতিহাস লিখে গেছে।

এই ইতিহাসে লেখা আছে যে, দু'হাজার এক বছর আট মাস থেকে দু'হাজার পঁয়তাল্লিশ বছর আট মাস পর্যন্ত পৃথিবী ঘোর সংকটের সম্মুখীন হবে। বর্তমান সভ্যতা লুপ্ত হবে, নতুন এক সভ্যতা জন্ম নেবে। এই সভ্যতা কেমন হবে তা লেখা নেই। সে সময় তো আগতপ্রায়!

পিরামিডে প্রবেশপথ, করিডর ও চেম্বারগুলির নামকরণ করেছেন পণ্ডিতেরা যেমন 'কুইনস চেম্বার' পর্যন্ত প্রবেশপথের নাম 'দ্বিতীয় জন্ম বা নতুন জন্মের পথ'। 'কিংস চেম্বার' বা রাজকক্ষের পাশের ঘরের নাম 'চেম্বার অফ ট্রিপল ভেল' অথবা 'ট্রুস ইন কেওস'।

যে করিডরের মাপ বিচার করে পৃথিবীর সংকটকালের সময় জানা যায় সেই করিডরের নাম "চেম্বার অফ দি মিস্ট্রী অফ দি ওপন টুম্ব"। তারপর আছে "চেম্বার অফ দি গ্র্যাণ্ড ওরিয়েণ্ট', 'দি হল অফ দি জাজমেণ্ট অফ দি নেশনস'।

মাটির নিচে যে প্রকোষ্ঠ আছে তার নাম 'দি চেম্বার অফ কেয়স' অথবা 'আপসাইড ডাউননেস'। এই নামগুলির অনুবাদ করার চেষ্টা থেকে

বিরত হলুম কারণ আগ্রহী পাঠকগণ যদি মিশর সম্বন্ধে বিদেশী বই পড়েন বা পিরামিড দেখতে মিশরে যান তাহলে নামগুলি চিনতে তাঁদের বেশি বেগ পেতে হবে না। কারণ বিদেশী বই বা পিরামিডের গাইড বইতে উক্ত নামগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে বলে শুনেছি।

আমাদের ভারতীয় নামগুলিও ভাষায় অনুবাদ করা যায় কিন্তু কোনো বিদেশী ভারতে এসে সেই বিদেশী ভাষায় অনূদিত পাত্র বা স্থানের নাম খোঁজ করলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়বেন। বম্বে এয়ারপোর্টে নেমে যদি কোনো ইংরেজ জিজ্ঞাসা করেন, এখান থেকে 'অ্যাবোড অফ দি স্নোজ' কত দূর ? তাহলে তিনি যে হিমালয়ের খোঁজ করছেন তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবে।

অনেক প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে পিরামিড তো নির্মিত হলো এবং ভেতরে ফারাও বা রাণীদের মমিও শায়িত হলো সেই সঙ্গে বহু মূল্যবান সামগ্রী ও আসবাবে মমির প্রকোষ্ঠ সাজিয়েও দেওয়া হলো। সমস্যা হলো চোর ও ডাকাত। এরা যাতে মমির ঘরে ঢুকে চুরি বা লুঠপাট করতে না পারে।

চোর-ডাকাতদের প্রবেশ বন্ধ রাখার জন্যে রাজা রাণীর মমি-প্রকোষ্ঠে যাবার মূল প্রবেশপথটি বিরাট একটা গ্র্যানাইট পাথরের ব্লক দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রবেশপথ অপেক্ষা এই পাথরের ব্লকটির দুই পাশ ও মাথার দিক মাত্র এক ইঞ্চি করে বড়।

চোর-ডাকাতরাও কম চালাক নয়। পাথরের পাশের দেওয়াল নরম বেলে পাথরে তৈরি। সেই দেওয়াল পুরু হলেও পাথর তো নরম অতএব সিঁধ কাটতে অসুবিধে নেই। চোর-ডাকাতরা হয়তো জানতো যে মমির ঘরে ঢুকলে এবং কোনো সামগ্রী স্পর্শ করলে শাপ লাগবে কিন্তু তবুও তারা নিরস্ত হয় নি। নাকি তারা শাপ-প্রতিরোধক কোনো মাদুলি বা তাবিজ ধারণ করতো কারণ শাপ লেগে কোনো চোর-ডাকাতের মৃত্যু হয়েছে এমন কোনো কাহিনী শোনা যায় নি। তবে চোর-ডাকাত কিসে মারা গেল সে খবর কি ঐতিহাসিকরা রাখে ?

চোর-ডাকাতরা দামী সামগ্রী তো চুরি করতই এমন কি মমিও চুরি

করেছে। কতকগুলি প্রকোষ্ঠ তো একেবারেই শূন্য হয়ে গিয়েছিল।
আধুনিক যুগে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে খালিক আলি মামুন রয়েল চেম্বারে প্রবেশ করেন। আরবরা প্রবেশপথ খুঁজে পাচ্ছিল না। সেই গ্র্যানাইট ব্লক তারা দেখেছিল এবং পাশে গর্তও দেখেছিল কিন্তু সেটা যে প্রবেশ-পথ হতে পারে, পাথরের ওধারে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি আছে তা তারা বুঝতে পারে নি।

যখন খোঁজাখুঁজি চলছে, এখানে ওখানে ঠোকাঠুকি চলছে এমন সময়ে ওপরে কোথাও একটা ভারি পাথর পড়ার আওয়াজ হলো। পাথরটি এমন একটি দণ্ডের ওপর এমন ভাবে স্থাপিত ছিল যে পাথরটি ঘোরানো যেত এবং রয়েল চেম্বারে প্রবেশ করার পথ খুলে যেত। যে কারণেই হোক পাথরটি পড়ে যায় এবং পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলিবাবা যে চল্লিশজন দস্যুদের ধনাগারে 'চিচিং ফাঁক' বলে প্রবেশ করতো সেই ধনাগারের প্রবেশপথও বোধহয় এই রকম কোনো ঘূর্ণায়মান পাথর দিয়ে বন্ধ করা ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত 'পিরামিড প্রফেসি'-এর বিশ্বাসীরা পৃথিবীর অনেক শহরে অফিস খুলে প্রফেসি-এর সমর্থনে প্রচার কার্য চালাতো; পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করতো কিন্তু মহাযুদ্ধের পর এই প্রচার কার্য অনেক কমে গেছে।

নতুন এক রহস্য

২

১৯৩২ সালে হিউবার্ট লারচারের নাম কেউ জানতো না। জানবার কথাও নয় কারণ তখন তার বয়স মাত্র বারো। এই ছেলেই উত্তর জীবনে ইউরোপের খ্যাতনামা প্যারাসাইকোলজিস্ট হয়েছে। ফরাসি সরকার নানা বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করে। এছাড়া ডঃ লারচার প্যারিসে ইণ্টারন্যাশানাল মেটাফিজিকস ইনস্টিটিউটের পরিচালক কমিটির মেম্বার এবং ফরাসি পত্রিকা 'রেভ্যু মেটাফিজিকস'-এর সম্পাদক।

তা সেই ১৯৩২ সালে হিউবার্ট লারচার যখন দক্ষিণ ফ্রান্সে নাইস শহরের ইসকুলে পড়তো তখন একদিন ইসকুল থেকে ফেরবার সময় একটা বড় দোকানের শো-উইণ্ডোতে তার দৃষ্টি আটকে গেল। দোকানে কাঁচের ওপারে অনেক কিছু সাজানো থাকে, দামও লেখা থাকে, কিন্তু যা দেখে হিউবার্টের দৃষ্টি আটকে গেল তা সচরাচর দোকানের শো-উইণ্ডোতে দেখা যায় না।

দক্ষিণ ফ্রান্সে নাইস বেশ বড় শহর এবং দোকানটিও বেশ বড়। মালিকদের নাম অনুসারে দোকানের নাম, বভিস অ্যাণ্ড প্যাসেরন। নানা রকম জিনিস বিক্রয় হয়, ঘর-গেরস্থালীর ও রান্নাঘরের সরঞ্জাম থেকে মিস্ত্রিদের ব্যবহার-যোগ্য সামগ্রী এবং আরও অনেক কিছু বিক্রয় হয়। এ হেন দোকানে এমন জিনিস সাজানো রয়েছে কেন?

হিউবার্ট মেধাবী ছাত্র, রাস্তায় চলবার সময়েও তার সব দিকে নজর, সব বিষয়ে তার প্রশ্ন, সবকিছু জানবার প্রবল আগ্রহ, তাই এই দৃশ্য তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

হিউবার্ট দেখলো শো-উইণ্ডোর ভেতরে অন্যান্য সামগ্রী থেকে একটু স্বতন্ত্র করে রাখা রয়েছে ছোট একটি ফাঁপা পিরামিড আর সেই পিরামিডের নিচে রয়েছে ছোট ছোট জন্তুর কয়েকটি শুষ্ক মৃতদেহ। হিউবার্ট জানতো পিরামিড মিশরের প্রাচীন কীর্তি। টুটানখামেনের বিষয়ও সে কিছু পড়েছিল। তা সেই পিরামিডের সঙ্গে এই মৃত জন্তুগুলির কি সম্পর্ক? ঐ পিরামিড বা জন্তুগুলিও যে বিক্রয় করা হবে তা নয় কারণ অন্যান্য সামগ্রীর মতো পিরামিডের গায়ে দাম লেখা নেই।

দোকানের অন্যতম মালিক অ্যান্টয়েন বভিসের উদ্ভাবনী শক্তি আছে, নানা বিষয়ে তার দক্ষতা, অনেক কিছু সে নাড়াচাড়া করে। নানারকম আকৃতির আধারের শূন্য স্থান নিয়ে সে পরীক্ষা করেছে। চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, ফানেল, পাইপ ইত্যাদির ভেতরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু আছে তার 'রাডিএস্থেসিয়া' মাপবার একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রও বভিস তৈরি করেছে। রাডিএস্থেসিয়া ব্যাপারটা কি? বভিস বলে ঐ সকল বিভিন্ন আকৃতির শূন্য স্থানে কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কিছু ভালো বা খারাপ কাজ করতে পারে। এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই হলো রাডিএস্থেসিয়া। এবিষয়ে বভিস অনেক বক্তৃতাও দিয়েছে।

বভিস চিয়পস্ পিরামিডের ভেতর ঢুকেছিল এবং তার যন্ত্র দিয়ে পিরামিডের ভেতরের রাডিএস্থেসিয়া মেপে এনেছে। মাপবার পেণ্ডুলাম যন্ত্রটির সে পেটেণ্ট নিয়েছে।

পেণ্ডুলাম যন্ত্র দিয়ে পিরামিডের ভেতরের রাডিএস্থেসিয়া মাপবার পর বভিসের ধারণা জন্মেছে যে পিরামিডের আনুপাতিক মাপে যদি ফাঁপা পিরামিড তৈরি করা হয় এবং তার নিচে মৃত প্রাণী রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলি মমি হয়ে যাবে, পচে যাবে না। বভিস নিজে যে পিরামিডের মডেল তৈরি করেছে তার রাডিএস্থেসিয়া মেপে বভিস দেখেছে যে মূল পিরামিড ও তার তৈরি মডেল পিরামিডের রাডিএস্থেসিয়া এক, কোনো তফাত নেই।

বভিস-উদ্ভাবিত এই ফাঁপা পিরামিড ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানী

মহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ঐ ফাঁপা পিরামিডের ভেতরে রহস্যময় ও অদৃশ্য শক্তি নিরূপণের যন্ত্রটির বভিস নামে দিয়েছে "বভিস স্পেশাল ম্যাগনেটিক পেণ্ডুলাম"। বভিস-উদ্ভাবিত এই যন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণে বভিস দাবি করছে যে ভৌত-বিজ্ঞানে সে "ল অফ রাডিএস্থেসিয়া" নামে একটি সূত্র আবিষ্কার করেছে।

বর্তমানে জানা গেল যে, এই রাডিএস্থেসিয়া সূত্র আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভারতেও এব চর্চা আছে।

নাইস শহরে তার অংশীদাবের সঙ্গে দোকানটি চালানো ছাড়াও বভিস "আর্টিসানাট এ বভিস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালায়। এখানে সে তার 'প্যারা-ডায়া-ম্যাগনেটিক' পেণ্ডুলাম তৈরি করে এবং মমিকবণে সাহায্য করে, চুম্বকভিত্তিক এমন সব যন্ত্রপাতি তৈরি করে।

বভিস-উদ্ভাবিত এই পিবামিড চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন বেডিও এঞ্জিনিয়ারকে আকৃষ্ট করলো, তার নাম ডঃ ক্যারেল জ্রবাল। কিন্তু বিববণী পড়ে জ্রবাল পিরামিডের এই রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাস কবে নি। বভিসেব সঙ্গে জ্রবাল চিঠি লেখালেখি আরম্ভ করলো। জ্রবাল শেষ পর্যন্ত বভিসের নির্দেশ অনুসারে চিয়পস্ পিরামিডেব অনুকরণে আনুপাতিক মাপের ছোট কয়েকটা মডেল পিবামিড তৈরি করলো এবং আশ্চর্যেব ব্যাপাব সেগুলি কার্যকর হলো!

পরীক্ষামূলকভাবে জ্রবাল সেই পিরামিডের তলায় মরা ব্যাং, টিকটিকি, সাপ ইত্যাদি রেখে দেখলো যে সেগুলি পচে যাচ্ছে না, শুকিয়ে মমি হয়ে যাচ্ছে। এ যেন ম্যাজিক! তারপর রাখল বীফ, মাটন, ডিম, ফুল। অবাক কাণ্ড! মাংস পচবার নাম নেই, ফুল বাসি হচ্ছে না!

বভিসকে জ্রবাল চিঠি লিখে সব জানালো এবং স্বীকার করলো যে সে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে, কি করে যে এটা সম্ভব তা সে বুঝতে পারছে না। জ্রবালকে বভিস লিখলো যে এসব নাকি রেডিও এঞ্জিনিয়ারের মাথায় ঢুকবে না।

বভিসের কাছ থেকে অমন একখানা চিঠি পেয়ে জ্রবাল কিন্তু নিরুৎসাহ হলো

না। পিরামিডপাওয়ার অর্থাৎ পিরামিডের এই অদৃশ্য শক্তি ও তা নিয়ে সে নিজে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে সে বিষয়ে ফরাসি ও বেলজিয়ান পত্রিকায় গাদা গাদা প্রবন্ধ লিখতে লাগলো। জ্রবাল এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ফাঁপা মডেল পিরামিড রহস্যময় এক শক্তি বিকিরণ করে। জ্রবাল একটা নতুন পরীক্ষায় হাত দিলো। তার দেশে তখন দাড়ি কামাবার ব্লেডের খুব অভাব। সে অনেক কষ্টে এক প্যাকেট ব্লু গিলেট ব্লেড সংগ্রহ করেছিল। কয়েকবার কামাবাব পর একখান। পুরনো ব্লেড সে পিরামিডের নিচে রেখে দিলো। সে ভেবেছিল যে ব্লেডখানা ভোঁতা হয়ে যাবে। ক্ষতি নেই কিন্তু অদৃশ্য রশ্মির প্রতিক্রিয়াটা তো জানা যাবে। ফল হলো বিপরীত। কয়েক দিন পরে জ্রবাল ব্লেডখানা পিরামিডের নিচে থেকে বাব করে ক্ষুরে লাগিয়ে ভয়ে ভয়ে দাড়িতে টান দিলো। অবাক কাণ্ড! ধার তো একটুও কমেই নি উপরন্তু নতুনের চেয়ে যেন বেশি ধার। এখানেই শেষ নয়। নতুন ব্লেডে সে কামাতো পাঁচ দিন এখন দেখলো পঞ্চাশ দিন কামাবার পর ব্লেডের ধার কমতে আবস্ত করেছে।

তবে একটা মজা জ্রবাল লক্ষ্য করলো। কোনো একটা পুরনো ব্লেড পিরামিডেব নিচে রাখবার পর বেশিবার কামানো গেল না, কিন্তু কয়েক দিন পরে সেটিকে আবার পিরামিডের নিচে রাখবার পর অভীষ্ট ফল পাওয়া গেল, পঞ্চাশ বার আবার কামানো গেল। এরকম কেন হলো তার কারণ সঠিকভাবে জানা গেল না।

জ্রবালের মাথায় তখন এক বুদ্ধি এলো। সে স্থির করলো ব্লেডের ধার পুনরুদ্ধারের জন্যে মডেল পিরামিড তৈরি করে সে বাজারে বিক্রি করবে। পেটেন্ট নেবার জন্যে ১৯৪৯ সালে জ্রবাল চেকোশ্লোভাকিয়ার পেটেন্ট একজামিনেশন কমিশনের কাছে আবেদন করলো। সে আশা করেছিল যে দু'তিন বছরের মধ্যেই সে তার "রেজর ব্লেড পিরামিড"-এর পেটেন্ট পেয়ে যাবে কিন্তু সেই পেটেন্ট পাওয়া গেল দশ বছর পরে! ইতিমধ্যে জ্রবাল পিরামিড রশ্মির রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছিল। তার ধারণা পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র এবং কসমিক রশ্মির সূক্ষ্ম তরঙ্গ উভয়ে

মিলে পিরামিডের অভ্যন্তরে এক রহস্যজনক রশ্মি উৎপাদন করে, এই রশ্মির অদৃশ্য শক্তি অনেক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটাচ্ছে। অদৃশ্য এই শক্তি পিরামিড আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো আকৃতির আধারে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, দ্রবাল তাও লক্ষ্য করেছে।

পেটেণ্ট পাবার পর দ্রবাল কার্ডবোর্ডের তৈরি মডেল-পিরামিড বিতরণ আরম্ভ করলো এবং আরও কঠোরতর পরীক্ষায় মনোযোগ দিলো।

দ্রবাল পিরামিড রশ্মি এবং তার পরীক্ষার ফল জানিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বহু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতো, কিন্তু তার পরীক্ষার কথা ইউরোপের বাইরে সাড়া জাগায় নি। আটলান্টিকের ওপারে খবর পৌঁছয় নি। অ্যামেরিকার মানুষ পিরামিডের এমন চাঞ্চল্যকর খবর পায় নি।

এ হেন সময়ে অ্যামেরিকা থেকে দু'জন লেখিকা ইউরোপ ভ্রমণে এলেন, একজনের নাম শীলা অস্ট্রাণ্ডার অপরজনের নাম লিন স্রোডার। দেশে ফিরে তাঁরা একখানা বই লিখেছিলেন, বইয়ের নাম 'সাইকিক ডিসকভারিজ বিহাইণ্ড দি আয়রন কারটেন'। এই বইতেই তাঁরা পিরামিডের রহস্যময় রশ্মির কথা লিখেছিলেন।

প্রাগে গিয়ে তাঁরা এক বন্ধুর বাড়িতে একটা মডেল পিরামিড দেখে। মডেল পিরামিড তো ঘর সাজাবার জন্য থাকতেই পারে কিন্তু তার নিচে একটা দেশলাই কেন? আর দেশলাইয়ের গায়ে ঠেস দেওয়া একখানা রেজর ব্লেড কেন? ব্লেডের ধার বাড়াবার জন্যে ওটি ওভাবে রাখা হয়েছে। উত্তর শুনে তাঁরা তো অবাক।

অবাক হবার তখন কিছু বাকি ছিল। তাদের সেই চেক বন্ধু মহিলাদের অ্যাণ্টয়েন বভিসের কথা বললেন। বভিস ইজিপ্টে চিয়পস্ পিরামিডের ভেতরে ঢুকেছিল। বাইরে তো বেশ গরম ছিল, বভিস ক্লান্ত, ভেতরেও ভ্যাপসা গরম কিন্তু বভিস অবাক হলো পিরামিডের ভেতরে একটি ডাস্টবিন দেখে। ডাস্টবিনে মৃত বেড়াল এবং অন্য প্রাণীরও মৃতদেহ পড়ে রয়েছে কিন্তু বভিস এই দেখে অবাক হলো যে প্রাণীগুলি পচে যায় নি এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে না। প্রাণীগুলির দেহ শুকিয়ে মমি হয়ে

গেছে অথচ ভেতরে বেশ কিছু পরিমাণে জলীয় বাষ্প রয়েছে।
লেখিকা দু'জন আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁরা দ্রবালের কথাও শুনলেন এবং অবিলম্বে দ্রবালের সঙ্গে দেখা করে তার অভিজ্ঞতার বিষয় জানতে চাইলেন। দ্রবালের আবিষ্কারের কথা, তার রেজর ব্লেড পিরামিডের কথা, ভিয়েনায় তার ছাত্রজীবন, প্যারিসে সাত বৎসর, পিয়ানো বাদন এবং প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন। দ্রবাল তাঁদের বললো বেহালার তারে ছড় টানলে যে সুমধুর ও মিষ্টি সঙ্গীত বেজে ওঠে তার জন্যে বাদকের কৃতিত্ব অপেক্ষা বেহালার বিশেষ আকার ও ভেতরের ফাঁপা জায়গাটাই দায়ী।
দ্রবাল ওদের আর একটা কথা বোঝালো। ডাইনিরা মাথায় তিনকোণা টুপি পরে কেন? তিনকোণা অর্থাৎ 'পিরামিড শেপ'। সে বললো পিরামিড শেপের টুপি পরিয়ে সে মানুষের মাথাধরা সারিয়ে দিয়েছে। সে শীঘ্রই মাথাধরা সারাবার জন্যে "ম্যাজিক হ্যাট" তৈরি করবে এবং তার পেটেন্টও নেবে।
শীলা এবং লিন, এই দুই লেখিকার মনে অন্যান্য প্রশ্নও উদয় হয়েছিল যেমন ক্ষুরের ধার অক্ষুণ্ণ রাখা এবং মাথাধরা সারানো ইত্যাদি ছাড়া পিরামিড কি পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করতে পারে? গাছের বৃদ্ধিসাধন করতে পারে? পিরামিডে নিহিত শক্তি কি দু'জন মানুষের মধ্যে তৃতীয় কোনো শক্তি সঞ্চার করতে পারে?
এই সকল প্রশ্নের উত্তর লেখিকা দু'জন দিতে পারে নি তবে তাদের বই প্রকাশিত হবার আগে গাছ ও বীজ নিয়ে কেউ কেউ পরীক্ষা আরম্ভ করেছিল এবং সাফল্য লাভ করেছিল। সে কথা যথাস্থানে বলবো।

পাঁচ ছ' হাজার বছর পূর্বে নির্মিত পিরামিড আজও রহস্য, মানুষের কাছে নানাভাবে পিরামিড আজও আকর্ষণীয়। তার নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অনেক মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে। বর্তমানে পিরামিড আর এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। 'পিরামিডলজি, নামে অভিনব এক

বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, 'পিরামিড পাওয়ার' আখ্যাত সেই রহস্যময় ও অদৃশ্য শক্তি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

এই দিকে ব্যাপকভাবে গবেষণায় প্রথমে যারা হাত দেয় তাদের মধ্যে ক্যানাডার টরণ্টোর নিউ হরাইজন রিসার্চ ফাউণ্ডেশন-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। রেজর ব্লেডের ধার কি করে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এ-নিয়ে তারা অনেক গবেষণা করছে, তবে অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করলেও সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পরে নি। ঐ ফাউণ্ডেশনের মিসেস আইরিস ওয়েন বলছেন পিরামিড পাওয়ারের প্রভাবে সুনিদ্রা হয়, শিশুর দেহের সার্বিক উন্নতিসাধন হয়। যাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, ধ্যান করেন তাঁরা অধিকতর মনঃসংযোগ করতে পারেন, যদি তাঁরা পিরা-মিডের আকারের উপাসনা গৃহে ধ্যান করতে বসেন।

পিরামিডলজির গবেষণা নিয়ে আমেরিকায় মজার কাণ্ডও কিছু ঘটেছে। মার্টিন গার্ডনারের নাম এদেশে জনসাধারণের জানা নেই, তবে যাঁরা 'সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান' নিয়মিত পড়েন তাঁরা জানেন। অংকের ধাঁধাঁ নিয়ে তিনি এই পত্রিকায় একটি ফিচার লেখেন। 'টাইম' পত্রিকা গার্ডনারকে বলেছে "দি ম্যাথেম্যাজিসিয়ান"।

১৯৭৪ সালের জুন সংখ্যার সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান পত্রিকায় গার্ডনার অন্য ধরনের একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং এই প্রবন্ধ মারফত পাঠকদের তিনি দারুণ একটা ধোঁকা দিয়েছিলেন।

গার্ডনার লেখেন যে, তিনি নেভাডায় পিরামিড লেকে বেড়াতে গিয়ে-ছিলেন। ঐ হ্রদের মাঝখানে জল ফুঁড়ে যে ত্রিকোণ পাহাড়টি জেগে উঠেছে তার নাম পিরামিড রক। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত সংখ্যাবিদ ডঃ আরভিং জোশুয়া ম্যাট্রিক্স, তাঁর আধা-জাপানী সুন্দরী কন্যা আইভা এবং একজন রেড ইণ্ডিয়ান ভৃত্য, নাম রি কিন্তু রি-এর আছে মাত্র একটি দাঁত তাই ওকে 'ওয়ান-টুথ রি' নামে ডাকা হতো, ওয়ান-টু-থ্রি নয়।

কাছেই কোথায় বুঝি ডঃ ম্যাট্রিক্সের একটি কারখানা ছিল। সেই কার-খানায় ছোট মডেলের পিরামিড তৈরি হচ্ছে ও সরবরাহ করা হচ্ছে।

গার্ডনারকে ডঃ ম্যাট্রিক্স এই কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। ডঃ ম্যাট্রিক্স বললেন প্রাচীন মিশরীয় যারা পিরামিড তৈরি করেছিল তারা একটা অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব জানতো যার দ্বারা তারা ভারি ভারি পাথরকে বাতাসে ভাসিয়ে স্থানান্তর করতে পারতো। অদৃশ্য এই শক্তির নাম "সাই-অর্গ এনার্জি"।

আমরাও শুনেছি যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ব্যতীত প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা নাকি আরও একটি মাপ জানতেন যার দ্বারা তাঁরা অদৃশ্য হতে পারতেন। প্রাচীনরা কত কি জানতো!

ডঃ ম্যাট্রিক্স নাকি গার্ডনারকে বলেন যে একজন ডঃ হ্যারল্ড পুটোন মিশরে পিরামিডের ভেতরে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পিরামিডের ভেতরে থাকাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি দূরে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে পারে, চোখের আড়ালে কোনো বস্তুর শব্দ শুনতে পায় বা সেটিকে দেখতেও পায়, অনুভূতি শক্তিও প্রচণ্ড বেড়ে যায়। এজন্যে অবশ্য মানসিক প্রস্তুতি ও বিশ্বাস প্রয়োজন। ডঃ ম্যাট্রিক্স নাকি 'সাই-অর্গ' শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছেন এবং সেই শক্তির সাহায্যে নানা রকম সামগ্রীর পেটেন্ট নিয়েছেন যার মধ্যে আছে পিরামিড রেফ্রিজারেটর, পিরামিড কফিন (যার মধ্যে মৃতদেহ রাখলে পচবে না) এবং পিরামিড সেপটিক ট্যাংক।

প্রবন্ধটির শেষে মার্টিন গার্ডনার লিখেছেন যে ডঃ ম্যাট্রিক্স এবং তাঁর কন্যা আইভা নিজেদের তৈরি একটি পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করে জাদুকর ম্যাণ্ড্রেকের মতো নিজেদের আত্মাকে 'সাই-অর্গ' শক্তির সাহায্যে তিব্বতে একটি প্রাচীন মঠে নিমেষে চালান করে দিতে পারেন।

গার্ডনার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার পাঠকরা অনুভব করলো যে, মাসটা যদিও জুন তবুও তাদের এপ্রিল ফুল করা হচ্ছে। গার্ডনারের ধাপ্পা পাঠকরা ধরে ফেলেছিল। তারা গার্ডনারকে চিঠি লিখতে লাগলো, গার্ডনার কয়েক শত চিঠি পেল, সকলেই জানতে চাইলো 'সাই-অর্গ এনার্জি' ব্যাপারটা কি?

হাওয়াই থেকে একজন চিঠি লিখেছে যে এখানে একজন মহিলা মার্টিন গার্ডনারের আগেকার লেখাগুলি পড়ে এখানে তিনি পিরামিড পাওয়ারের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি কাচ ও প্লাস্টিকের পিরামিড তৈরি করিয়েছেন এবং কাছেই গাছপালা ঘেরা নদীর ধারে সেই পিরামিডের ভেতর বাস করছেন। শহরে একটা হেলথ ফুড স্টোর তাদের তৈরি যাবতীয় খাবার-দাবার একটা পিরামিডের নিচে রাখতে আরম্ভ করেছে।

সেই ভদ্রলোক আরও লিখেছে, গার্ডনার যদি হাওয়াই এসে পিরামিড পাওয়ার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে রাজি হন তাহলে তারা সব খরচ বহন করবে। গার্ডনার যায় নি কিন্তু দেখা গেল যে পিরামিড পাওয়ার ইউরোপের সীমানা ছাড়িয়ে আমেরিকা অতিক্রম করে হাওয়াই পেঁৗছে গেছে।

মার্টিন গার্ডনার একখানা বই লিখেছিল, দি ইনক্রেডিবল ডঃ ম্যাট্রিক্স। বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়ে পিরামিড পাওয়ার উপজীব্য করে বইখানা লিখেছিলেন। সেই বই পড়ে একজন প্রকাশক গার্ডনারকে পনেরো হাজার ডলার অগ্রিম দিতে চাইলো, শুধু পিরামিড পাওয়ার-এর ওপর তাকে একখানা বই লিখে দিতে হবে। প্রকাশকের প্রস্তাবটি ছিল অদ্ভুত। প্রকাশক পিরামিড পাওয়ার বিশ্বাস করে নি। সে গার্ডনারকে বলেছিল বেনামে বইখানা লিখতে এবং একবছর পরে বইখানার প্রতিবাদ করে স্বনামে একখানা বই লিখতে। গার্ডনার স্বভাবতই রাজি হয় নি।

পিরামিড ও পিরামিড পাওয়ার দুইই রহস্যে পরিপূর্ণ। দু'টি বিষয় নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। মিশর ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন আকারের পিরামিড দেখা যায়, তাদের নিয়ে কত গাথা, কত কাহিনী, কত রহস্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পিরামিড নিয়ে ওয়ারেন স্মিথও একখানা বই লিখেছেন, 'দি সিক্রেট ফোর্সেস অফ দি পিরামিড'। তিনি লিখেছেন পিরামিডের সঙ্গে নক্ষত্রের যোগ আছে, ভিন গ্রহের জীব এসে 'গিজে'-এর পিরামিড তৈরি করে দিয়ে গেছে এবং এই গিজে

পিরামিড ভিন গ্রহের জীবদেরই বার্তা বহন করছে। পিরামিডগুলি নাকি সৌরজগতের অনেক খবর দেয়, অসীম সৌরজগতের অনেক খবরই পাওয়া যায়। যে যেমন ব্যাখ্যা করেন। ক্লাইং সসারদের পথনির্দেশ করে নাকি পিরামিড। ওয়ারেন স্মিথ লিখেছেন পিরামিডকে একটা বিরাট লাইব্রেরি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তাঁর মতে গিজে পিরামিড থেকে বিভিন্ন বিষয়ে, ৩৭০০টি তথ্য পাওয়া যায়।

ওয়ারেন স্মিথ আরও লিখেছেন যে হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিসের খবরও এই পিরামিডগুলিতেই পাওয়া যায়। আটলান্টিসে যে পাথর পাওয়া যেতো সেই পাথর পিরামিডগুলির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। ওয়ারেন স্মিথ পিরামিডের অদৃশ্য শক্তি বিশ্বাস করেন তবে তাঁর স্থির বিশ্বাস পিরামিডগুলি ভিন গ্রহের প্রাণীরাই তৈরি করে দিয়েগেছে এবং এই পিরামিড মারফতই তারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতো ও পৃবিবীর খবর সংগ্রহ করতো।

পিরামিড নিয়ে অনেক রহস্য, আগেও বলেছি, পরেও অনেকবার বলতে হবে কিন্তু কোনো একটা রহস্যের সমাধান বা ব্যাখ্যা হবার আগে সব রহস্য জমতে জমতে রহস্যের তাসের বাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

নতুন একটা রহস্যের কথা বলছি। পিরামিডের সঙ্গে পুনর্জন্মবাদের কোথায় বুঝি একটা যোগসূত্র আছে এই ব্যাপারটা নিয়ে এখনও হৈচৈ শুরু হয় নি বা এই বিষয়ে এখনও কোনো বই লেখা হয় নি কিন্তু অতিন্দ্রিয়বাদীতে বিশ্বাসী এবং লেখিকা মিসেস রুথ মণ্টগোমারির 'কম্পানিয়নস অ্যালং দি ওয়ে' বইখানা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যে এ-বিষয়ে শীঘ্রই পিরামিডকে আসরে নামানো হবে।

ঐ বইয়ের এক জায়গায় মিসেস মণ্টগোমারি লিখেছেন যে প্রেতরা তাঁকে বলেছে যে তিনি দু'হাজার বছর আগে একবার জন্মেছিলেন, সেবারও তাঁর নাম ছিল রুথ এবং তিনি ছিলেন বাইবেলের ল্যাজেরাসের বোন। একদিন ভাবাবেশের সময় প্রেতরা তাঁর হাত দিয়ে লিখিয়েছিল যে "যখন

তোমার বয়স মাত্র সাত বছর তখন তুমি আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখতে পেয়েছিলে আর দেখতে পেয়েছিলে মেষপালকদের যারা গ্রামের চৌ-রাস্তায় জমায়েত হয়েছিল, তারপর তুমি যখন জানতে পারলে যে মেষ-পালকরা বেথলিহেমে একটি শিশুর জন্ম ঐ নক্ষত্র ঘোষণা করছে তখন তোমার আনন্দের আর সীমা ছিল না।"

মিসেস মণ্টগোমারি লিখেছেন যে প্রাচীন মিশরে তিনি পরে আরও তিনবার জন্মেছিলেন। তিনি আরও একখানা বই লিখেছেন 'এ ওয়ার্ল্ড বিয়ণ্ড'। এই বইয়ে লিখেছেন যে অতীতের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন। উদাহরণস্বরূপ লেখিকা আব্রাহাম লিংকনের নাম উল্লেখ করে বলেন যে দীর্ঘদিন পরে লিংকন আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি নিউ অরলিনসে বাস করছেন এবং আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রো সমস্যা নিয়ে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ফাউণ্ডেশনে তাঁকে এ বিষয়ে কাজ করতে দেখা গেছে।

অতীতের রুথ যদি বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বই লিখতে থাকেন এবং আব্রাহাম লিংকন পুনরায় ভিন্ন নামে পৃথিবীতে আবার জন্মে জাতি-বিদ্বেষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন তাহলে চিয়পসের পিরামিড যখন তৈরি হচ্ছিল এবং সেই পিরামিডের নির্মাণ-কাজের সঙ্গে জড়িত এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে বর্তমানে পিরামিডের রহস্যভেদে যে নিযুক্ত নেই এ কথা কে বলতে পারে?

অনেক সময়ে শিশুদের মধ্যে আশ্চর্য প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। জন্মান্তর-বাদীরা বলেন সেই শিশু হলো অতীতের কোনো প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে তার প্রতিভা নিয়েই আবার জন্মগ্রহণ করেছে। তাই দেখা যায় অনেক শিশু দ্রুত অংক করতে পারে, বড় কবিতা একবার শুনেই মুখস্থ বলতে পারে, তবলা পিয়ানো বাজায়। এই প্রসঙ্গে খ্যাতানামা সুরস্রষ্টা মোৎ-সার্টের নাম উল্লেখ করা যায়। এই শিশুদের 'প্রডিজি' বলা হয়।

পিরামিড রহস্য নিয়ে বই লিখছে এমন একজন মার্কিন প্রডিজির নাম জানা গেছে। তার নাম প্যাট জে ফ্ল্যানাগান, বাড়ি ক্যালিফরনিয়া। প্যাট যখন বালক তখনই সে বধিরদের জন্যে নিউরোফোন নামে একটি শ্রবণযন্ত্র আবিষ্কার করে। বিখ্যাত 'লাইফ' পত্রিকা "আমেরিকার সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ যুবক যুবতী" তালিকায় তার নাম ঘোষণা করেছিল।
প্যাট ফ্ল্যানাগান পরে বভিস এবং ড্রবালের মতো মডেল পিরামিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে। টম ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে প্যাট পিরামিড নিয়ে কিছু কাজ করে। ভ্যালেণ্টাইন তার 'দি গ্রেট পিরামিড' বইতে লিখেছে "প্যাট নিঃসন্দেহে একটি প্রতিভা"।
পিরামিড সম্বন্ধে প্যাট নিজেও কয়েকখানা বই লিখেছে, যথা 'পিরামিড পাওয়ার', 'বিয়ণ্ড পিরামিড পাওয়ার' ইত্যাদি। আমেরিকার একদিকে টথ (পুবে নিউ ইয়র্কে) আর অপরদিকে (পশ্চিম ক্যালিফরনিয়াতে) প্যাট ফ্ল্যানাগান পিরামিডের যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে।
ফ্ল্যানাগানের বিশ্বাস মডেল পিরামিড পৃথিবীতে যুগান্তর আনবে, মানুষের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করবে। ফ্ল্যানাগান নিজেও অনেকগুলি পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছেন। পিরামিডের নিচে রক্ষিত একখানি মাত্র ব্লেডে সে দু'শোবার কামিয়েছে তবে সে প্রতিবার কামাবার পর আয়ন-মুক্ত ডিস্টিলড ওয়াটার দিয়ে ব্লেড ধুয়ে একই ফল পেয়েছে। কে জানে এই তথ্য পিরামিড রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করবে কি না।
ফ্ল্যানাগান দেখেছে যে মডেল পিরামিডের ভেতরে যে-কোনো জায়গায় কাঁচা মাংস, ফল বা দানা শস্য রেখে দিলে তা অবিকৃত থাকে।
১৯৭৪ সালে ফ্ল্যানাগান ইজিপ্টে গিয়েছিল। চিয়পস পিরামিডের ভেতরে কিংস চেম্বারে সে রাত্রিবাস করার সময় অসাধারণ এক শক্তি অনুভব করে কিন্তু সেই শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে সে কিছু বলে নি। সে স্বীকার করেছে যে এই শক্তি তার জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দেশে ফিরে সে কয়েকটা মডেল পিরামিড তৈরি করে কিন্তু মূল পিরামিডের মাপের সঙ্গে কিছু পার্থক্য ছিল। এই মডেলগুলি নাকি বভিস বা ড্রবাল নির্মিত

মডেল অপেক্ষা অধিক কার্যকরী।

নিউ ইয়র্কে ম্যাক্স টথ পিরামিডলজি নিয়ে অনেক ভালো কাজ করেছে। গ্রেগ নিয়েলসেনের সহযোগে সেও ‘পিরামিড পাওয়ার’ নামে একটি বই লিখেছে। পিরামিডলজি নিয়ে আমেরিকাতেও বেশ চর্চা হচ্ছে। ব্যক্তি-গতভাবে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও পিরামিড নিয়ে অনেকে নাড়াচাড়া করছে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে আছে ম্যানকাইণ্ড রিসার্চ আনলিমিটেড যার অধ্যক্ষের নাম ডঃ কার্ল স্লেশার। পিরামিডলজি নিয়ে এখানে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ডঃ স্লেশার বলেছেন যে গবেষণা সম্পূর্ণ হলে তার ফল মানবজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হবে, এক কথায় মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমূল পরিবর্তন আনবে। ভবিষ্যতে মানুষ হয়ত পিরামিড আকারের বাড়িতে বাস করবে, ফ্রিজ বাতিল করে মডেল পিরামিড খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করবে, ইলেকট্রিক বিল কমবে। কয়েক ধাপ পর্যন্ত সবজি উৎপাদন ও ফুলের চাষ মডেল পিরামিডের সাহায্যেই করা হবে। এ ধরনের কাজ তো আরম্ভ হয়েই গেছে তবে এখনও প্রসার লাভ করে নি।

ওয়াশিংটনের চিকিৎসক ডঃ ব্রোসি ভার্ন বলেন যে ভৌতবিজ্ঞান ও জীবন-বিজ্ঞানে পিরামিডলজি পরিবর্তন আনবে।

ন্যাশনাল ইনকুয়ারার নামে পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে ডঃ স্লেশার বলেছেন যে একটা পরীক্ষা করে তাঁরা দারুণভাবে উৎসাহিত বোধ করছেন। অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে তাঁরা কিছু মটরশুঁটি এবং লিমা বিনের বীজ পিরামিডের মতো একটি ত্রিকোণ পত্রের নিচে রেখেছিলেন এবং কিছু বীজ কাছেই এক জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। জল সেচন করেন নি কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে চারা বেরোবার পর দেখা গেছে ত্রিকোণ পাত্রের নিচে চারা আগে বেরিয়েছে, সেগুলি বেশি লম্বা হয়েছে এবং অধিকতর পুষ্ট হয়েছে। কাঁচা মাংস রেখেও দেখা গেছে যে উন্মুক্ত স্থানে রাখা মাংস অপেক্ষা মডেল পিরামিডের নিচে রাখা মাংস দ্বিগুণ সময়

তাজা থাকে।

আরও একটি পরীক্ষা খুবই আশাপ্রদ। ছ'জন ব্যক্তিকে চার রাত্রি নকল পিরামিডের নিচে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছিল। ইলেকট্রনিক মনিটর যন্ত্র বসিয়ে দেখা গিয়েছিল যে সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা তাদের ঘুম আরও গভীর হয়েছিল এবং যাদের রক্তচাপ কিছু উচ্চ ছিল তা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে গিয়েছিল।

ঐ ন্যাশানাল ইনকুয়ারার পত্রিকা ডঃ স্লেশারের সঙ্গে সাক্ষাতকারের বিবরণী-সম্বলিত সংখ্যাখানি ড্রবালের মন্তব্যের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। ড্রবাল বলেন যে গাছের বীজ নিয়ে পরিক্ষা করে তিনি অনুরূপ ফল পেয়েছেন তবে নকল পিরামিডের ভেতরে নিদ্রার পরীক্ষা তিনি করেন নি। নিজে যাচাই না করে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন না।

আমেরিকা সবে পিরামিডলজি গ্রহণ করেছে। টথ, ভ্যালেণ্টাইন, ফ্ল্যানাগান এবং স্লেশার প্রমুখ ব্যক্তিরা কাজ আরম্ভ করেছেন। অ্যারিজোনা ও ক্যালিফরনিয়াতেও ভিন্ন দিকে কাজ আরম্ভ হয়েছে এখানকার ব্যক্তিরা পিরামিড পাওয়ার মাধ্যমে ফ্লাইং সসারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় আছেন। ভিন্ন দেশের সাধু সন্তদের যোগাযোগ করার চেষ্টাও তারা করছেন। এই সকল গবেষকদের কথা পরে বলবো। যে যে-বিষয়েই পরীক্ষা করুন, ব্যাপক ও স্থায়ী ফল আশা করতে হলে আরও অনেক পরীক্ষা বার বার করতে হবে। তবেই তার ফল গ্রাহ্য হবে এবং ক্রমশ প্রসার লাভ করবে।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এমন একদিন আসতে পারে যেদিন পৃথিবীতে খাদ্যাভাব ঘটতে পারে। এজন্যে কেউ কেউ নতুন ধরনের খাদ্যের সন্ধান করছে। তারা অনুমান করে ভবিষ্যতে সমুদ্র খাদ্যাভাব থেকে মানুষকে বাঁচাবে। সমুদ্রের প্ল্যাংকটন, জলজ উদ্ভিদ, মাছ ইত্যাদি থেকে নতুন ধরনের খাদ্য তৈরি করা হবে।

ক্যানাডায় টরন্টোর উপকণ্ঠে লেস ব্রাউন নামে একজন ভদ্রলোক পিরামিডের সহায়তায় তাঁর ক্ষেতে শস্যের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা

করেছেন। ব্রাউন দাবি করছে যে পরিমাণ জমিতে দশ থেকে পনেরো পাউণ্ড টোম্যাটো পাওয়া যেতো এখন সেই পরিমাণ জমিতেই পিরামিডের সহায়তায় সে পঞ্চাশ থেকে ষাট পাউণ্ড টোম্যাটো পেয়েছে। তার বর্তমান পিরামিডটির উচ্চতা তিরিশ ফুট। সে চৌষট্টি ফুট উচ্চ একটি পিরামিড তৈরি করছে। ব্রাউন আশা করে যে পিরামিডের সহায়তায় সে বছরে যতবার ইচ্ছে ফসল তুলতে পারবে। সে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা আশাপ্রদ।

ব্রাউন কয়েকটা পরীক্ষা করে অদ্ভুত সাফল্যলাভ করেছে। সে বলছে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য মডেল পিরামিডের নিচে (মডেল পিরামিডকে ব্রাউন বলে পিরামিড জেনারেটর) কিছুদিন রাখলে তা মমি হয়ে যাবে। এই 'মমি খাবার' অনির্দিষ্টকাল রাখা যাবে এবং পরে তা গরম জলে ভিজিয়ে আবার তাজা করে খাওয়া যাবে। আমরা যে শুঁটকি মাছ বা শুকনো সবজি সংরক্ষণ করি তার স্থায়িত্বের একটা সীমা আছে এবং স্বাদেরও পরিবর্তন হয় কিন্তু মমি খাদ্যের বেলায় তা হবে না।

ক্যানাডা খুব ঠাণ্ডা দেশ; শাক-সবজি, ডিম, মাংস, মাছ অনেক দিন তাজা থাকে, সহজে পচে যায় না। ব্রাউন একটি কাঁচা ডিম কিছুকাল তার পিরামিড জেনারেটরের নিচে রেখে দেয় তারপর সেটিকে বাইরে এনে খোলা জায়গায় তিন সপ্তাহ রেখে দেয়। ডিমটির চেহারা বদলাতে থাকে, কয়েকদিন পরে মনে হলো এটি বুঝি প্লাস্টিকের ডিম। তিন সপ্তাহ পূর্ণ হতে ব্রাউন ডিমটি জলে ভিজতে দিলো। ডিম তার স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এলো তখন সে সেই ডিমটির পোচ বানালো। ডিম খারাপ হয় নি, পোচ তাজা ডিমের মতোই হয়েছে, স্বাদেরও উন্নতি হয়েছে।

নিরাশার কথাও শোনা যাচ্ছে এই ক্যানাডা থেকেই। টরন্টো থেকে প্রকাশিত ফিনানসিয়াল পোস্ট ম্যাগাজিনের ১৯১৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের নাম 'দি পিরামিড পুশার', লেখক ওয়েন লিলি। ওয়েন লিখছে ক্যানাডার ইউনিভার্সিটি অফ গুলেপ খ্যাতনামা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুব নামডাক। এখানে অনেক

নামী দামী ব্যক্তি আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার বিভাগের চেয়ার-ম্যান ডঃ ইবননিক স্বয়ং পিরামিড সাহায্যে পরীক্ষা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি একই চারা ও বীজ নিয়ে দু'বার পরীক্ষা করেছেন এবং পিরামিডের সহায়তায় ও বিনা পিরামিডে, একই সময়ে পরীক্ষা করে তিনি পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি। এমন কি একই কীট উভয় ক্ষেত্রের চারা আক্রমণ করেছিল, চারার আকৃতি একই হয়েছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হার্মান টিসেন বলেন গাছের বৃদ্ধির মূলে পিরামিডের কোনো প্রভাব নেই। পিরামিড পাওয়ার সমর্থন করতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন বিদ্যুৎভাণ্ড লাইডেন জার আবিষ্কৃত হলো বা যেদিন বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে নামিয়ে আনলেন সেদিন কেউ কি আশা করে-ছিল যে ঐ বিদ্যুৎ একদিন পৃথিবী চালাবে? পিরামিড পাওয়ার এখনও ঐ লাইডেন জার অবস্থায় আছে।
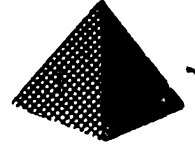
কিছু ভ্রমণ, কিছু ইতিহাস

৩

আদিকাল থেকে মানুষেব ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে সে ইতিহাসের অনেকগুলি পরিচ্ছেদ জুড়ে আছে আহারের সন্ধানে মানুষের অভিযান কাহিনী। ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায়, আহারের সন্ধানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছুটে বেড়ানোর কাহিনী।

প্রাচীন মানুষ যেখানে আহারের সন্ধান পেয়েছে সেখানে সে পাকাপাকি-ভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং এইভাবে ভারতে সিন্ধু নদ উপত্যকায়, পঞ্জাবে, ইউফ্রেটিন-টাইগ্রিস উপত্যকায় ও নীল নদের তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

আহারের সন্ধানে মানুষকে যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ছুটে বেড়াতে হয়, রুক্ষ প্রকৃতি থেকে সন্তানদের রক্ষা করবাব জন্যে, ঘর তৈরি করবার জন্যে অনেকটা সময় খরচ করতে হয়, তাহলে সে এই দু'টি সমস্যা সমাধান ব্যতীত অন্য কিছুর জন্যে চিন্তা করবে কখন ?

নীল উপত্যকায় এসে মানুষ আবিষ্কার করলো এখানকার জমি উর্বর, প্রচুর শস্য জন্মায়, প্রকৃতি সহনশীল। তখন এখানে আফ্রিকা, আরব ও পশ্চিম এশিয়া থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে এলো, এখানে বসতি স্থাপন করলে এবং ক্রমে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠলো।

খাদ্য উৎপাদন ও বাসস্থান নির্মাণ করেও মানুষ দেখলো তার হাতে এখন প্রচুর সময় থাকে। তখন অবসর সময়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে আরম্ভ করলো প্রত্যহ একই সময়ে সূর্যের উদয় হয় কি করে ? নদীতে জোয়ার আসে একই সময়ে, বছরে বন্যারও নির্দিষ্ট সময় আছে। এসব

কি করে হয় ?

আবার কেউ অবসর সময়ে হাতের কাজে মন দিলো। ভালো অস্ত্র, লাঙল বা তাঁত তৈরি করল, কেউ ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে, নতুন ধরনের মন্দির বানায়। এইভাবেই তো সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

সাধারণ মানুষ ভাবতো যারা প্রাকৃতিক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তারা তাদের চেয়ে জ্ঞানী। এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলতেন যে একজন অদৃশ্য দেবতা কোথাও আছেন তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি হলেন অসিরিস। মৃত্যুর পর সৎ মানুষের আত্মা তাঁর আশ্রয়ে সুখে থাকে অতএব মানব-জীবন হলো তাঁরই পদতলে আশ্রয় লাভ ও অনন্ত সুখের জীবনের প্রস্তুতি।

এসব তো প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতোই, তারা আরও বিশ্বাস করতো যে মানুষের আত্মা অসিরিসের কাছে একা যেতে পারে। পৃথিবীতে আত্মার গৃহ হলো দেহ, আত্মাকে সেই দেহ নিয়ে অসিরিসের কাছে যেতে হবে নচেৎ তাঁর কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

অতএব মানুষ মরে গেলে তার দেহ রক্ষা করা দরকার। সেইজন্য মানুষ মরে গেল তার আত্মীয়রা মৃতদেহে কিছু প্রলেপ দিয়ে সেটি রক্ষা করবার চেষ্টা করতো এবং এ কাজে তারা সফলও হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে কয়েক হাজার বছর পরেও মৃত মিশরীয়ের দেহ বা 'মমি' নষ্ট হয় নি।

মৃত্যুর পর দেহটি তারা কয়েক সপ্তাহ সোডিয়ম মিশ্রিত জলে ভিজিয়ে রাখতো তারপর দেহে বেশ করে পিচ মাখিয়ে দিতো। প্রাচীন পারসিক ভাষায় পিচ হলো "মুমিআই"। মুমিআই শব্দটি থেকে 'মমি'। পিচ মাখা-বার পর মৃতদেহটিকে এক বিশেষ ধরনের বস্ত্র দ্বারা পাকের পর পাক দিয়ে জড়ানো হতো। আরও কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ছিল এবং এইভাবেই মমি তৈরি হতো।

মমিটি কফিনে পুরে সমাধি গৃহে রাখা হতো। গোড়ার দিকে কদিন রাখা হতো পাহাড়ের গুহায়, কিন্তু পরে যখন মিশরীয়রা তাদের বাসস্থান ত্যাগ

করে অন্য দেশে গেল সেখানে পাহাড় বা গুহার অভাব, চারদিকে বালির রাশি। মমির সমাধি গুহা নেই, তাছাড়া আছে হিংস্র জন্তু ও দস্যুদল। এদের হাত থেকে মমিকে রক্ষা করতে হবে।

তখন তারা মমির জন্যে সমাধি বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করলো। সমাধি বাড়ির যে ঘরে কফিন থাকতো সেখানে যাতে মৃতের আত্মার কোনো অসুবিধে না হয়, সেজন্যে একজন জীবিত মানুষের বাড়িতে যে সর্ব উপকরণ থাকা দবকার, মমির সমাধি ঘরেও সেইসব উপকরণ ও চিত্ত-বিনোদনের সরঞ্জামও সাজিয়ে দেওয়া হতো। আত্মার সেবার জন্যে প্রতীক স্বরূপ ভৃত্য, পাচক, রক্ষী ইত্যাদিরও মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হতো সমাধি ঘরে।

এ হলো একেবারে আদি যুগের কথা। তারপর তো তারা আস্তে আস্তে পিরামিড তৈরি করতে শিখলো। উচ্চতা বোঝাতে মিশরীয়রা 'পির-এম-আস' শব্দটি ব্যবহার করতো। পরে গ্রীকরা বলতো পিরামিড। ফারাও-দের মৃতদেহ বা মমি থাকতো পিরামিডে। 'ফারাও' শব্দের অর্থ হলো যিনি বড় বাড়িতে বা প্রাসাদে বাস করেন।

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস আলোচনা করা বর্তমান পরিচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য নয় তবে বর্তমান মিশর ও পিরামিড একবার দেখা দরকার এবং সেই প্রসঙ্গে কিছু ইতিহাস আলোচনা।

অনেকের ধারণা যে মিশরে সভ্যতা উন্মেষের কিছু পরে কিন্তু প্রাগৈতি-হাসিক যুগেই বুঝি তখনকার সভ্য মানুষের মিশরের পিরামিডগুলি তৈরি করেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। পিরামিড যখন তৈরি হয় তখন মিশর রীতিমতো সভ্যদেশ। মিশরীয়রা তখন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, রীতিমতো উন্নত জাতি।

কৌতূহলী পাঠকরা ই আই এস এডওয়ার্ডস লিখিত 'দি পিরামিডস অফ ইজিপ্ট' বইখানি পড়ে নিতে পারেন। মিশর ও পিরামিড সম্বন্ধে এটি একখানি প্রামাণ্য বই।

মিশরের সভ্যতা কতো পুরনো এবং ফারাওদের প্রাচীন সভ্যতা কতো বছর

স্থায়ী হয়েছিল? যীশুর কাল এখন আমাদের চেয়ে অনেক দূরে, প্রায় দু'হাজার বছর। ঐতিহাসিকরা বলেন মহেঞ্জোদাড়োর বা মিশরের সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর বা তিন হাজার বছর পুরাতন। কথাটা স্পষ্ট হলো কি? খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যে কোনো দেশে সভ্যতা প্রচলিত ছিল সেই সভ্যতায় পৌঁছতে সে দেশের মানুষের কত দিন লেগেছিল? ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে নীরব থাকেন। যেমন বলা হয় ভারতের বেদ খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে লিখিত হয়েছিল। হ'তে পারে কিন্তু বেদের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একখানি গ্রন্থ রচনা করবার বিদ্যা আয়ত্ত করতে কতদিন লেগেছিল।

ফারাওদের সময় পিরামিড নির্মিত হয়েছিল কিন্তু যীশুর পূর্বেও যে সব ফারাও ছিল এবং যাদের সময় পিরামিড নির্মিত হয়েছিল তারাও অনেক দূরের মানুষ।

প্রাচীন মিশরের যে ইতিহাস আমরা জানি তার বয়স মোটামুটি তিন হাজার বছর এবং সে ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত : ওল্ড কিংডম, মিডল কিংডম এবং নিউ কিংডম।

ওল্ড কিংডম আরম্ভ হওয়ার অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নীল নদের উর্বর উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। নীল উপত্যকাকে বেষ্টন করে মরুভূমি থাকলেও এই মানুষগুলি ঐ মরুভূমির মানুষ নয়, তারা এসেছিল অন্য দেশ থেকে। তারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে কচিৎ মরুভূমিতে যেতো, যাবার দরকারও হতো না, তারা তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু নীল-নদের উপত্যকাতেই পেত।

যে দেশটাকে আমরা এখন ইজিপ্ট বলি অর্থাৎ নীল উপত্যকার ঐ প্রাচীন মানুষেরা কাদা থেকে ইট তৈরী করে বাড়ি বানাতো। তারা মাটির পাত্রও তৈরি করতে পারতো। জমি ছিল উর্বর, শস্য ফলাতে বেগ পেতে হতো না।

নীল উপত্যকায় তথা মিশরে কালক্রমে দু'টি পৃথক রাজ্য গড়ে ওঠে। একটির নাম আপার ইজিপ্ট অপরটির নাম লোয়ার ইজিপ্ট। নীলের

উজান ও ভাটা অনুসারে এই নাম প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে তাই আপার ইজিপ্ট হলো নিচে আর লোয়ার ইজিপ্ট হলো ওপরে। নীলেরও গতিপথ উলটো। নীলই পৃথিবীর একমাত্র বড় নদী যা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত। তাই ভূমধ্যসাগর থেকে নৌকো চেপে নদীতে প্রবেশ করে উজানের দিকে যেতে থাকলে আগে লোয়ার ইজিপ্ট পরে আপার ইজিপ্ট।

পাশাপাশি দু'টি পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে উঠলো, একটি আপার ইজিপ্ট অপরটি লোয়ার ইজিপ্ট। উভয় সাম্রাজ্যেব জনগণের আচাব-ব্যবহার ও সংস্কৃতি একই প্রকার হলেও রাজনীতিক পার্থক্য ছিল উভয় রাজ্যের মধ্যে। আপার ইজিপ্টের রাজা মাথায় পরতেন শ্বেতবর্ণের রাজমুকুট আর লোয়ার ইজিপ্টের রাজা পরতেন রক্তবর্ণের মুকুট, ঔদ্ধত্যের প্রতীক। পাশাপাশি দুই ইজিপ্ট এইভাবে কয়েক শত বৎসব টিকে ছিল, তারপর একদিন আপার ইজিপ্টের রাজা নরমের একদিন লোয়ার ইজিপ্ট জয় করে নিয়ে দুই ইজিপ্ট এক কবে দিলো। এই এক ইজিপ্ট অনেক শক্তিশালী হলো, অন্য দেশের ওপর প্রভুত্ব খাটাতে লাগালো এবং নিজেদেরও অনেক উন্নতি সাধন করলো। কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার, রাজার প্রতাপ অগ্রাহ্য করাব ক্ষমতা কারও নেই। রাজা যে শুধু চোখ রাঙাতো তা নয়, ভালো শাসক হিসেবেও রাজা সুনাম অর্জন করেছিল। অনেক শিল্পকীর্তির মধ্যে পিরামিড নির্মাণেও হাত দিয়েছিল রাজা নরমের। তবে সে পিরামিড ও পরবর্তী পিরামিডে পার্থক্য অনেক।

রাজা নরমের-এর রাজ্যজয় বা শাসনব্যবস্থার কোনো পুরো ইতিহাস পাওয়া যায় না। যা থেকে নরমের-এর কিছু ইতিহাস ও কীর্তিকলাপ জানা যায়, সেটি হলো প্রসাধন সামগ্রী চূর্ণ করার পাথরের একটি বড় পাত্র। সেকালে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে প্রসাধন চূর্ণ করার পাত্রে বা পানপাত্রে সেই ঘটনার সচিত্র বিবরণী খোদাই করা হতো।

এইরকম একটি বড় পাত্রে নরমের-এর বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

পাত্রের একদিকে ফারাও নরমেরের একটি মূর্তি আঁকা আছে, মাথার একপাশে আঁকা আছে একটি ছেনি আর অপর দিকে আঁকা আছে একটি মাছ। সেকালের মিশরীয় ভাষায় ছেনির নাম ছিল 'নর' আর মাছ হলো 'মের'। মুকুটের রং লাল অর্থাৎ তখন তিনি আপার ইজিপ্টের রাজা কিন্তু বিপরীত দিকে দেখা যায়, নরমের শাদা ও লাল উভয় রঙের মুকুট পরেছে অর্থাৎ তখন তিনি দুই ইজিপ্টের রাজা।

ইজিপ্টোলজিস্টদের মতে নরমেরই হলেন ইজিপ্টে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময় থেকেই ইজিপ্টে প্রথম রাজবংশ বা ফার্স্ট ডায়নাস্টির সূত্রপাত। পিরামিড বলে যাকে চেনা যায় তেমন কোনো কাঠামো প্রথম দুই ডায়নাস্টির শাসনকালে তৈরি হয় নি তবে সূত্রপাত হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা এই সময়টাকে বলে প্রোটো-ডায়নাস্টিক, আদি বংশ। আদি বংশের ফারাওদের সমাধিকে বলা হতো 'মাস্তাবা'। 'মাস্তাবা' আরবী শব্দ। বর্তমানে মিশরীয়দের বাড়ির বাইরে বেঞ্চের মতো একরকম বসবার আসন দেখা যায়, সেগুলিকে 'মাস্তাবা' বলা হয়। বাড়ির কর্তা সন্ধ্যার সময় এই মাস্তাবায় বসে কফি পান করেন, গল্প-গুজব করেন।

আদি যুগে ফারাওদের মাটির নিচে ইটের ঘর বানিয়ে কবর দেওয়া হতো। মৃতদেহ সমেত কফিন যে প্রকোষ্ঠে থাকতো সেই প্রকোষ্ঠ ব্যতীত আরও দু'একটা প্রকোষ্ঠ থাকতো। সেই প্রকোষ্ঠে মৃতের প্রয়োজনে লাগতে পারে এবং তার কিছু প্রিয় সামগ্রী ঐ প্রকোষ্ঠে রাখা হতো। তারপর মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর বড় বড় মাস্তাবা তৈরি করা হতো। পাশাপাশি বা একটার ওপর আর একটা অর্থাৎ দ্বিতল, ত্রিতল অনেকগুলি মাস্তাবা তৈরি করা হতো। সাতাশটা পর্যন্ত মাস্তাবা দেখা গেছে। মাস্তাবাগুলির মধ্যেও প্রকোষ্ঠ থাকতো। সেই প্রকোষ্ঠেও ফারাওর প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন সব সামগ্রী রাখা থাকতো। মাস্তাবাগুলি ইট দিয়ে তৈরি করা হতো।

এই মাস্তাবা থেকেই পিরামিডের ধারণা জন্মায়। প্রথম পিরামিড তৈরি হয়েছিল তৃতীয় রাজবংশের ফারাও জোসারের সমাধিক্ষেত্রে। এই

প্রথম পিরামিড যে তৈরি করেছিল তার নাম জানা গেছে। তার নাম ইমহোটেপ।

ইমহোটেপ ছিলেন একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, নানা বিদ্যায় পারদর্শী। বর্তমান যুগের লেওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি বা বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে।

ইমহোটেপ ছিল ফারাও জোসারের মন্ত্রী, প্রধান চিকিৎসক, রাজনীতিক উপদেষ্টা এবং আরও কিছু ছিলেন হয়তো।

চিকিৎসক হিসেবে ইমহোটেপ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দু'হাজার বছর পরে গ্রীকরা তাকে তাদের চিকিৎসকদের গুরু অ্যাসক্লিপিয়াস বলে দাবি করেন। গ্রীকরা বলে ইমহোটেপ মিশরীয় নয়, সে গ্রীক, গ্রীস থেকে সে মিশরে গিয়েছিল। সে যুগেও ভারত থেকে বাণিজ্য করতে ভারতীয়রাও মিশর দেশে যেতো, কেউ কেউ সেখানে বসবাসও করতো, ফিরে আসতনা। প্রাচীন ভারতীয়রা প্রাচীন মিশরকে মিশ্রদেশ বলতো। অনেকে ইজিপ্টকে আগুপ্ত বলেন এবং দাবি করেন তা একদিন নাকি ভারত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তারা আরও বলেন যে প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার সহায়তায় পিরামিড নির্মিত হয়েছিল।

জোসারের ওপর যে পিরামিড ইমহোটেপ তৈরি করেছিলেন তা ছিল একটার ওপর আর একটা পাথরে তৈরি মাস্তাবা এবং তার উচ্চতা ছিল ছয় তলা। সমাধি-নির্মাণে এই প্রথম পাথর ব্যবহৃত হলো এবং তা প্রবর্তন করলো ইমহোটেপ। পণ্ডিতেরা এই পিরামিডগুলিকে বলেন স্টেপ পিরা-মিড, বোধহয় ধাপে ধাপে শীর্ষে ওঠা যেত।

মরুভূমিতে জোসারের দেখাদেখি আরও কয়েকটি পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। তবে জোসারের পিরামিডটি ছিল ফারও-এর। অতএব তার কিছু রাজকীয় বৈশিষ্ট্য তো থাকবেই। মূল কবর ছিল মাটির নিচে এবং সেখানে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ থাকলেও ওপরে মাস্তাবার মধ্যে কয়েকটি পাথ-রের ঘর ছিল। সেই সব ঘরে ছিল দামী বিলাস-সামগ্রী, নানারকম উপ-করণ, পরলোকে ফারাও-এর কোনো কিছুর অভাবে যাতে অসুবিধা না হয়

সেদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল। ঘরগুলি ঘিরে ছিল প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণ ঘিরে কয়েকটি সভাগৃহ।

সভাগৃহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'হেব-সেদ' সভাগৃহ, সভাগৃহ ঠিক নয় বরঞ্চ একটি হলঘর। হেব-সেদ নামে একটি উৎসব প্রাচীন মিশরে চালু ছিল। এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে হত্যা করা এবং রাজার সম্মতি নিয়ে। সেকালে নিয়ম ছিল সিংহাসনে সর্বদা যুবক ও বলশালী একজন ফারাও আসীন থাকবেন। কারণ কি? সেকালে তো পার্শ্ববর্তী বা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই থাকতো এবং রাজারা স্বয়ং যুদ্ধ করতেন। অতএব সিংহাসনে এমন একজন রাজা অধিষ্ঠিত থাকা চাই যে তলোয়ার চালিয়ে, বর্শা ও তীর ছুঁড়ে বা প্রয়োজনে হাতাহাতি যুদ্ধেও শত্রু রাজাকে পরাভূত করতে পারবে।

এই উদ্দেশে হেব-সেদ উৎসবের আয়োজন করা হতো। উৎসবে নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকতো কিন্তু মূল অনুষ্ঠান ছিল ফারাও-এর শক্তি-পরীক্ষা। ফারাও পরাজিত হলে তাকে হত্যা করাই ছিল রীতি আর জয়লাভ করলে আবার তিনি সিংহাসনে বসতেন। এই ছিল হেব-সেদ অনুষ্ঠান বা উৎসবের উদ্দেশ্য।

জোসারের পিরামিডের একাংশে হেব-সেদ হলও নির্মিত হয়েছিল যাতে পরবর্তী জীবনেও জোসার এই উৎসব পালন করতে পারে এবং নিজের শারীরিক দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন।

সাকারা স্টেপ পিরামিডের কাছে জোসারের প্রস্তরমূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছিল। সেই মূর্তির বেদিতে ফারাও-এর মন্ত্রী, স্থপতি এবং চিকিৎসক ইমহোটেপেরও নাম পাওয়া যায়। ফারাও জোসেফের পিরামিডের কাছে ইমহোটেপেরও একটি ছোট পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। জোসেফ তাঁর এই সর্ববিদ্যাবিশারদ মন্ত্রীটির ওপর সন্তুষ্ট হয়েই এই পিরামিড নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

ইজিপ্ট এক্সপ্লোরেশন সোসাইটির ইজিপ্টোলজিস্ট ওয়ালটার বি এমেরি দীর্ঘ কুড়ি বছর পরিশ্রম করে ইমহোটেপের সমাধি খুঁজে পেয়েছিলেন।

ইমহোটেপের মৃত্যুর দু'হাজার বছর পরেও যে মিশরীয়রা তাকে ভোলে নি তার অনেক নিদর্শন এমেরি দেখেছিলেন।

এবার একটু ভ্রমণ।

নিউ ইয়র্কের সি ডব্লু পোস্ট কলেজের অধ্যাপক বব ব্রায়ার পিরামিড ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্যে মিশরে গিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কে নিউ ইসকুলে তিনি মিশরের ইতিহাস ও হাইরোগ্লিফ্স পড়ান। মিশরের ইতিহাসে তিনি সুপণ্ডিত কিন্তু খাস মিশবে যাওয়ার তাঁর সুযোগ হয় নি। শেষ পর্যন্ত একদল ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কায়রো গিয়েছিলেন এবং পিরামিড, প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি দেখার সুযোগ হয়েছিল। মিশর সম্বন্ধে আগ্রহী হবার প্রসঙ্গক্রমে প্রফেসর ব্রায়ার লিখছেন যে এর মূলে আছে বাসকেটবল খেলা। একবার বাসকেটবল খেলতে খেলতে আমি হাঁটুতে জোর আঘাত পাই, ফলে হাসপাতালে দীর্ঘদিন আমাকে রোগশয্যায় কাটাতে হয়।

সময় কাটাবার জন্যে আমার এক বন্ধু প্রাচীন মিশরে চিত্রলিপি দ্বারা ব্যবহৃত বর্ণমালা অর্থাৎ হায়রোগ্লিফের একখানি বই পড়তে দেন। বইখানি পড়তে আমার বেশ মজা লাগছিল। বইয়ের ছবি দেখে দেখে আমিও হাঁস, পেঁচা, পা ইত্যাদি আঁকতে আরম্ভ করলুম এবং ক্রমে সেই প্রাচীন লিপি পড়তে শিখলুম।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি আরও বই পড়ে টুটানখামেনের কবরে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি উদ্ধার করতে আমার অসুবিধা হয় নি। আমার আগেও সেই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছিল তথাপি আমি নিজের চেষ্টায় সেই লিপি পড়েছিলুম।

সেই থেকে মিশর সম্বন্ধে আমি আগ্রহী হই এবং মিশরের প্রাচীন ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করি। বিভিন্ন মিউজিয়মে যে সব নিদর্শন ছিল সেগুলিও দেখি। ক্রমে প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে আমি প্রচুর শিক্ষা লাভ করি এবং একটি কলেজে প্রাচীন মিশরের ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করি।

প্রাচীন মিশরের সব কিছুর মধ্যে পিরামিড আমাকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করতো এবং মিশর শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে পিরামিডের ছবি ভেসে উঠতো। ক্লাসে পড়াবার সময়েও লক্ষ্য করেছি ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে পিরামিড বিষয়েই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রশ্ন করতো।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমি মিশর যাই নি, পিরামিড দেখার কথা তো ওঠেই না। তাই ১৯১৪ সালে স্থির করে ফেললুম এবার দেশটা দেখে ফেলা দরকার। কিন্তু স্থির করলেই সমাধান হয় না। অর্থ চাই এবং আমার সেই অর্থের অভাব। তুই জায়গায় পড়াই, ছুটি নিতে হবে এবং ছুটি নিতে হবে এমন সময়ে যখন মিশরের আবহাওয়া আমরা সহ্য করতে পারবো। সেই সময়টা হলো ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত। তখন কায়রোর তাপ ৭০° ডিগ্রি ফারেনহিট থাকে, বেশ সহনীয়।

ছুটির ব্যবস্থা হলো। এবার ব্যবস্থা করতে হবে অর্থের। "পরিবার তায় সাথে যেতে চায়" অতএব দ্বিগুণ অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে অথচ আমার স্ত্রী বারবারার পিরামিড সম্বন্ধে আগ্রহ নেই কিন্তু আমি পরদেশে গিয়ে যদি কষ্ট অনেক পাই! অতএব তিনি যাবেন। বড় প্রশ্ন তু'জনের যাতায়াতের প্লেন ভাড়া।

একটা খবর পাওয়া গেল। ইজিপশিয়ান খ্রীশ্চানদের কপটিক চার্চ প্রায় আধা ভাড়ায় চার্টার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাদের মেম্বার হওয়া চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কপটিক চার্চের প্রধান ফাদার গেব্রিয়েলের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় ছিল। তাঁরই অনুমোদনে আমি ও বারবারা কপটিক চার্চের সোশ্যাল ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেলুম।

কায়রোতে আগে থেকে হোটেলে রুম রিজার্ভ করে রাখা দরকার। বন্ধুদের কাছে খবর নিয়ে জানলুম পিরামিড দেখতে হলে মেনা হাউসে অবশ্যই থাকতে হবে। হোটেলটি প্রায় পিরামিডের পদতলে, পিরামিডের ছায়া নাকি হোটেলের কম্পাউণ্ডে পড়ে।

হোটেলে চিঠি লিখলুম, তারা জানালো আমরা যে সময়ে যাব তখন কোনো

রুম খালি নেই, সব আগেই বুক হয়ে গেছে। কি আর করা যায়! যা থাকে বরাতে বিনা রিজারভেশনেই যাব। মজা এই যে, যখন কায়রো পৌঁছলুম এবং মেনা হাউসে পৌঁছলুম তখন অনেক ঘরই খালি। কি ব্যাপার? আমি প্রশ্ন করি, তোমরা যে লিখলে কোনো ঘর খালি নেই? ম্যানেজার বলল, আমাদের গুরুত্ব জানাবার জন্যে আমরা অমন লিখি, কিন্তু তুমি আর একবার লিখলে নিশ্চয় রুম পেতে, এখন বলো কি রকম ঘর পেলে তুমি খুশি হও।

আমার সঙ্গে অনেক ছাত্রও যেতে চায়। তাদের পিতার পয়সা আছে, অসুবিধে নেই অথচ আমি বেশি এবং যে-কোনো ছাত্র সঙ্গে নিতে চাই না। সি ডব্লু পোস্ট কলেজের ডিনের সঙ্গে আমি পরামর্শ করলুম। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি কি সব পরামর্শ করলেন তারপর আমাকে বললেন যে আমার মনোনীত ছাত্রদের আমি কায়রো নিয়ে যেতে পারি এবং সেজন্যে আমার যাতায়াতের প্লেনভাড়া ওঁরাই দিয়ে দেবেন কিন্তু আমাকে ইজিপ্টে ও দেশে ফিরে কয়েকটা লেকচার দিতে হবে। লেকচারের জন্যে তাঁরা আমাকে পারিশ্রমিকও দেবেন। আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল উপরন্তু আমার ছাত্র-ছাত্রীর দল বললো যে তারা চাঁদা তুলে কায়রোতে আমার ও বারবারার হোটেল বিল সমেত যাবতীয় খরচ তারা মিটিয়ে দেবে। চমৎকার! এর চেয়ে ভালো আমি আর কি আশা করতে পারি?

দলে আমরা মোট পনেরো জন। একটা ট্র্যাভেল এজেন্ট পাওয়া গেল। তারা বললো, কোনো চিন্তা নেই সব ব্যবস্থা তারা করে দেবে মায় হোটেল রিজারভেশন, কিন্তু পরে তারা কথা রাখতে পারে নি। সে আলাদা কথা। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে আমরা জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা আরম্ভ করলুম। বিমানে উঠে দেখলুম যে আমরা পনেরো জন ছাড়া আর সকল যাত্রী আরব। এয়ারপোর্টে ফাদার গেব্রিয়েল উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমাদের সকলের সিট পড়েছিল বাঁ দিকে। কায়রোর কাছে পৌঁছলে পিরামিড

দেখতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। মাত্র আঠারো ঘণ্টা, তার-পরই আমরা কায়রো পৌঁছে যাব।

প্যারিসে কিছুক্ষণ থামবার পর আমাদের বিমান আবার আকাশে উঠলো কিন্তু যাত্রা বুঝি আর শেষ হবে না। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা অধৈর্য হয়ে উঠছে, কখন তারা পিরামিড দেখতে পাবে? সন্ধ্যা হয়ে গেলে যে কিছুই দেখা যাবে না।

আমরা ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা তথা ইজিপ্টের ওপর এসে গেলুম। আর মাত্র কিছুক্ষণ! কায়রো টাইম ছ'টার সময় কি দেখলুম? তিন তিনটে পিরামিড। তাদেব দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। ছবিতে বা সিনেমায় যে রকম দেখেছি ঠিক সেই রকম। ছাত্রছাত্রীরা হৈচৈ শুরু করে দিলো। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না।

কায়েরো এয়ারপোর্টে বিমান নেমে পড়লো। এয়ারপোর্টে বেশ ভিড়, ভিড়ের মোটা অংশ বুঝি তীর্থযাত্রী। সেইরকম শুনলুম।

মোটাসোটা বিলিতি স্যুট পরা টাকওয়ালা মিশরীয় এক ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কি লাকি ট্যুর গ্রুপ? আমাদের ট্র্যাভেলিং এজেণ্টের নাম লাকি ট্যুর এবং লোকটির নাম মিঃ লতিফ। লতিফ আমাদের সকলের পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নিয়ে কাস্টমসের বেড়াজাল পার করে আমাদের সকলের মালপত্র একটা ঠেলা গাড়িতে বোঝাই করে এয়ারপোর্টের বাইরে এনে দু'খানা মিনিবাসে আমাদের চাপিয়ে দিলো যার সামনে লেখা আছে লাকি ট্যুর। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, তা হলেও হোটেলের দিকে যেতে যেতে মাঝে মাঝে আমরা পিরামিড দেখতে পাচ্ছিলুম।

মেনা হাউস হোটেলেই এসে উঠলুম, প্রায় পিরামিডের ছায়ার মধ্যে কয়েক পা হেঁটে পৌঁছনো যায়, হোটেলের জানালা দিয়ে পিরামিড দেখা যায়। সে পিরামিডটির নাম গিজে পিরামিড। হোটেল থেকে পিরামিড পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ট্যুরিস্টদের জন্যে দোকানের সার। দোকানদাররা চেঁচামেচি করে ডাকে, দোকানের সামনে দাঁড়ালেই পিপারমিণ্ট মেশানো

চা দেয়।

হোটেলে নাম লিখিয়ে মালপত্র রেখে আমি একা পিরামিড দর্শনে বেরিয়ে পড়লুম। পিবামিডের কাছে প্রায় যখন পৌঁছে গেছি তখন অন্ধকাব, কোথা থেকে ফেজটুপি পরা একটি লোক হঠাৎ এসে আমাকে বললো, কাম মিস্টার, আই শো ইউ পিরামিড, ভেরি ইণ্টারেস্টিং।

আমি বললুম, তোমাকে আমার এখন দবকার হবে না, এই তো আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। সে প্রায় নাছোড়বান্দা, আমি তখন তাকে বললুম তুমি কি কিছু জান? বলো তো এই গিজে পিরামিড কবে তৈবি হয়েছে? জান না তো। শোনো আমি বলছি, এটি তৈরি হয়েছে মিশবের চতুর্থ রাজবংশের সময়। ফারাও খুফুব এক ভাই যার নাম হেমন এবং যে ছিল খুফুর মন্ত্রী সে-ই এই পিরামিড তৈরি করিয়েছিল। জান কি এই পিরা-মিডে কুড়ি লাখ পাথর আছে। আর ঐ যে তিনটে ছোট পিরামিড দেখা যাচ্ছে ওগুলো খুফুর রাণীর? তাও জান না? এখন কেটে পড়।

সে নাছোড়বান্দা আমার কোনো কথাই শুনলো না। শুধু বলে, আমার সঙ্গে আস্থন না মিস্টার, আই শো ইউ ভেরি ইণ্টারেস্টিং?

আমি তখন ক্লান্ত। মনে মনে বিরক্ত বোধ করছি। পথটা একটু ওপবের দিকে উঠেছে, চড়াই আব কি। সেই গাইড এগিয়ে চললো। সামনে কয়েকটা ধাপ। আমি গাইডকে অনুসরণ করছি হঠাৎ সে পকেট থেকে ছোট একটা মোমবাতি বার করে জ্বালালো। সামনে একটা গেট।

দু'পাটি দাঁত বার করে গাইড বললো, এই দেখ চিয়পসের পিবামিড, ভেরি ইণ্টারেস্টিং।

আমি পিরামিডের পাথর স্পর্শ করে গাইডকে উপেক্ষা করে চলে আসছি। সে আমার সামনে এসে একগাল হেসে হাতপাতলো। আমি তাব হাতে একটা মার্কিনী সিকি দিলুম।

এ কি স্যার আমি এত কষ্ট করে মোমবাতি জ্বেলে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এলুম, চিয়পস পিরামিড দেখালুম, অন্ততঃ দুটো ডলার দিন।

যা দিয়েছি যথেষ্ট দিয়েছি, এখন আমাকে ছেড়ে দাও।

লোকটা তো চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে তো। পকেট হাতড়াতে লাগলুম এমন সময় হাতে রাইফেল নিয়ে একজন লোক এসে হাজির। তাকে দেখেই গাইড পালিয়ে গেল। হোটেলে ফিরে শুনেছিলুম রাইফেলধারী হলো পিরামিডের গার্ড আর গাইড বলে যে পরিচয় দিয়েছে তার লাইসেন্স নেই, তাই গার্ডকে দেখে পালিয়েছে। ওদিকে গার্ড কিন্তু আমাকে ছাড়ে নি। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাছে আমেরিকান সিগারেট আছে?

জাল গাইডের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছে অতএব তাকে একটা সিগাবেট দিয়ে হোটেলে ফিরে এলুম। খুব ক্লান্ত, ঘুমও পাচ্ছে। মনে মনে বেশ খুশি। কায়রোতে নেমেই আমি পিরামিড দেখেছি, স্পর্শ করেছি, সুদূর অতীতের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করেছি, তা সে যতই ক্ষীণ হোক।

স্টেপ পিরামিডের উল্লেখ তো আগেই করেছি। স্টেপ পিরামিড থেকে আসল পিরামিডের রূপান্তর রাতারাতি হয় নি। জোসার ছিল তৃতীয় বাংজবংশের ফারাও, তার পিরামিড ছিল স্টেপ পিরামিড। চতুর্থ রাজবংশ থেকে ধীরে ধীরে রূপান্তর আরম্ভ হলো। আমরা যে পিরামিড দেখতে অভ্যস্ত, যে আকৃতি দেখলে পিরামিড বলে চিনতে পারি সেই পিরামিড আরম্ভ হলো এই ফোর্থ ডায়নাস্টি বা চতুর্থ রাজবংশ থেকে।

জোসারের স্টেপ পিরামিড থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে মাইডুম নামে একটি পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রচলিত আকারের পিরামিড তৈরির এইটি হলো প্রথম প্রচেষ্টা। প্রথম প্রচেষ্টায় অনেক ভুল-ত্রুটির ফলে পিরামিডটি সঠিক ভাবে নির্মাণ করা যায় নি, যার ফলে এটি স্থায়িত্ব পায় নি, অকালে ভেঙে পড়েছিল। তবুও বিশেষজ্ঞেরা ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করতে পেরেছেন কি ভাবে বা পদ্ধতিতে পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছিল।

মাইডুম পিরামিড কার সমাধি তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। ভগ্নপ্রায়

দেওয়ালের গায়ে কিছু আঁকিবুকি দেখে অনুমান করা হয় এটি ফারাও স্নেফেরুর পিরামিড। সেই আঁকিবুকি পড়ে জানা যায় যে তৃতীয় টুথমোসিসের শাসনকালের একচল্লিশতম বৎসরে আমেনমেসুর পুত্র লিপি-কার আ-খেপের-রেসনেব ফারাও স্নেফেরুর এই সুন্দর সমাধি-মন্দির দেখে মুগ্ধ। তার মনে হয়েছিল এখানে যেন সূর্য উদয় হচ্ছে আর স্বর্গ বুঝি এখানে নেমে এসেছে। এই লিপি থেকে অনুমান করা যেতে পারে মাইডুম পিরামিড ফারাও স্নেফেরুর সমাধি-মন্দির।

মাইডুম পিরামিডের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। উত্তর দিকের প্রবেশ পথ সোজা নেমে গেছে ফারাও-এর মূল সমাধিতে যেখানে রক্ষিত ছিল তার মমি। ভূমির সঙ্গে এই প্রবেশ পথ আঠাশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে। আঠাশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে এমন একটা ঢালু পথ তৈরির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য বোধহয় ফারাও যাতে এই পথ দিয়ে দূরবীনের মতো সোজা ধ্রুবতারা দেখতে পান তবে বর্তমানে এই পথ দিয়ে ধ্রুবতারা দেখা যাবে না, কারণ তারার গতিপথ থেকে পৃথিবী কিছু সরে গেছে। এই রকম প্রবেশ পথ বা ইচ্ছাকৃতভাবে মাপজোপ হিসেব করা গলিপথ পরবর্তী কয়েকটি পিরামিডে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা তাই অনুমান করেন যে অতীতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পিরামিডে বসে তাদের মানমন্দিরের কাজ চালাতেন, গ্রহ নক্ষত্র দেখতেন।

মাইডুম পিরামিডের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রথম দেখা গেল যে ফারাও-এর মমি মাটির নিচে কোনো প্রকোষ্ঠে রাখা হয় নি। মমির স্থান নির্ধারিত হয়েছিল মাটির ওপরে বিশেষ একটি ঘরে মূল পিরামিডের অভ্যন্তরে। মমি পাওয়া না গেলেও মমির স্থান নির্ধারণ করতে অসুবিধা হয় নি। তবে স্নেফেরুর এইটি একমাত্র পিরামিড নাও হতে পারে।

সাকারা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে দাশুর। দাশুরে একটি হেলানো পিরামিড পাওয়া গেছে, তাই এর নাম বেণ্ট পিরামিড, ইটালিতে পিসার হেলানো স্তম্ভের মতো। এই বেণ্ট পিরামিড জোসারের পিরামিড বা মাইডুম পিরামিড অপেক্ষা আকারে বড়।

নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার সময় বোধহয় স্থির হয়েছিল যে প্রয়োজনানুসারে উপরিস্থ দেওয়াল মোটামুটি চুয়ান্ন ডিগ্রি ঢালু করা হবে কিন্তু পরে তা সাড়ে তেতাল্লিশ ডিগ্রি ঢালু করা হয় অর্থাৎ খাড়াই আরও কম করা হয়। এই পরিবর্তন করা হয় নির্মাণ কাজ যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। নির্মাণ কাজে এই অদলবদল করার জন্যে বোধহয় ত্রুটি ঘটে যায় যেজন্যে পিরামিড হেলে যায় অর্থাৎ একদিক বসে যায় এবং আজও সেই অবস্থাতেই আছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে বেণ্ট পিরামিড। কিন্তু 'বেণ্ট' কেন? নুয়ে পড়ার তো কথা নয়। হেলে গেছে বলেই তো পিসার স্তম্ভের নাম 'লিনিং টাওয়ার অফ পিসা'।

বেণ্ট পিরামিডের দু'টি পৃথক প্রবেশ পথ আছে এবং ভেতরে দু'টি পৃথক সমাধি-কক্ষ আছে যা আর কোনো পিরামিডে দেখা যায় না। দু'টি সমাধি-কক্ষের মধ্যে কোনোটিতে মমি বা আনুষঙ্গিক কোনো সামগ্রী পাওয়া যায় নি। সেসব অতীতে লুঠপাট হয়ে গেছে। অন্যান্য পিরামিডের মতো এই পিরামিডে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, প্রাঙ্গণ ও মন্দির আছে তবে অধিকাংশ বালি চাপা পড়ে আছে। বেণ্ট পিরামিডের দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখনও তেমন নজর দেন নি।

বেণ্ট পিরামিডের দু' মাইলের মধ্যে আছে 'রেড পিরামিড'। এই পিরামিডের লাল রঙের পাথরের জন্যে এই নামকরণ করা হয়েছে। বেণ্ট পিরামিডের কাজ সম্পুর্ণ হওয়ার পরেই এই পিরামিডের কাজে হাত দেওয়া হয়। বেণ্ট পিরামিডের নির্মাণকার্য থেকে নির্মাতারা কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকবে তাই গোড়া থেকেই উপরিস্থ দেওয়ালের ঢাল সাড়ে তেতাল্লিশ ডিগ্রি করা হয়েছে। বেণ্ট পিরামিডের মাথার ঢাল সাড়ে তেতাল্লিশ ডিগ্রি।

রেড পিরামিডের কাছে একটা লিপি পাওয়া গেছে যাতে স্নেফেরুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তার দু'টো পিরামিড আছে। অনুমান করা হচ্ছে যে মাইডুম এবং রেড পিরামিড ফারাও স্নেফেরুর।

হালে বেণ্ট পিরামিডে কিছু খনন কাজ চালাবার পর প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে রেড পিরামিডও ফারাও স্নেফেরু তৈরি করিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একজন ফারাও-এর তিনটে পিরামিড ছিল।

একজন ফারাওর দু'টি পিরামিড থাকতে পারে। একটি পিরামিড হতে পারে যদি সে লোয়ার ইজিপটের ফারাও হয় এবং অপর আর একটি পিরামিড থাকতে পারে যদি সে আপার ইজিপটেরও ফারাও হয়। কিন্তু একজন ফারাওর তিনটে পিরামিড কেন তা ঠিক জানা যায় নি। মনে হয়, মাইডুম পিরামিড ভেঙে পড়বার পর আর একটি পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল।

স্নেফেরু ছিলেন খুফুর পিতা। খুফুকে গ্রীকরা বলতো চিয়পস। কোনো পণ্ডিত বলেন খুফু ও চিয়পস এক ব্যক্তি নয়। রীতি ছিল যে ডিম্বাকৃতি একটা আংটিতে ফারাওরা হায়রোগ্লিফিক অক্ষরে তাঁদের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। আংটি বলতে আঙুলে পরবার আংটি নয় বরঞ্চ বলা যায় ডিম্বাকার একটি ছোট চাকা বিশেষ। ইজিপ্টোলজিস্টরা এগুলিকে বলেন 'কার্টুস'। খুফুর নামে খোদিত এমন কার্টুস পাওয়া গেছে আবার চিয়পস-এর নামেও কার্টুস পাওয়া গেছে। তাই কোনো পণ্ডিতের মানে সংশয় জেগেছে যে খুফু ও চিয়পস বুঝি এক ব্যক্তি নয়।

পিরামিড ঘিরে তো অনেক রহস্যই আছে অতএব তাদের ফারাওদের নিয়ে কিছু রহস্য থাকবে না, এমন হতে পারে না। আমরা সব খবর না জানলেও ইজিপ্টোলজিস্টরা মোটামুটি সব খবর জানেন।

খুফু বা চিয়পস নির্মিত পিরামিডটিকে 'গ্রেট পিরামিড' বলা হয়। এই পিরামিডে আড়াই লক্ষ গ্র্যানাইট পাথরের ব্লক আছে এবং প্রতিটি ব্লকের ওজন মোটামুটি আড়াই টন। এই পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল বাইশ বছর কিন্তু কত লোক কাজ করেছিল তার সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে মতান্তর আছে।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মিশরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে তিন মাস সময়কালে এক লক্ষ লোক

কাজ করতো। মনে হয়, এক লক্ষ তিন মাস পর্যায়ক্রমে কাজ করতো। এক দল এক লক্ষ শ্রমিক তিন মাস কাজ করার পর আবার অন্য এক লক্ষ শ্রমিক তিনমাস কাজ করতো। হেরোডোটাস বোধহয় এই কথা বলতে চেয়েছেন।

কেউ বলেন সারা বছর ধরে এত শ্রমিক কাজ করলে বাইশ বছরের আগেই পিরামিড তৈরি শেষ হয়ে যেতো। হেরোডোটাস সম্ভবত লিখেছেন নীল নদে বন্যার সময় কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা অলস হয়ে যেতো। তারা সেই তিন মাস পিরামিডে কাজ করতো এবং তাদের সংখ্যা এক লক্ষ। অর্থাৎ বছরে তিন মাস এক লক্ষ শ্রমিক কাজ করতো এবং বাকি ন'মাস আরও কমসংখ্যক শ্রমিক কাজ করতো। এটা সম্ভব কারণ, মিশর তথা পৃথিবীর জনসংখ্যা তখন কতই বা ছিল ?

পিরামিডের কাজ লক্ষ্য করলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। পাথরের ব্লকগুলি তো নিখুঁত মাপ অনুযায়ী চতুষ্কোণ করা হয়েছে এবং সেগুলি এমন চমৎকারভাবে বসানো হয়েছে যে আজও তারা নিশ্চল তো বটেই, কোথাও দুই পাথরের মধ্যে এমন একটু ফাঁক পাওয়া যাবে না যার ভেতর দিয়ে ছুরির ফলা ঢোকানো যায় !

যে কোয়ারি থেকে পাথর আনা হতো সেই কোয়ারিতেই পাথরের ব্লকগুলি তৈরি করা হতো। চৌকো করার জন্যে তামার তৈরি ছেনি ব্যবহার করা হতো। ব্লকগুলি পিরামিডের স্থানে আনাবার জন্যে পাথরের একটা অতি মসৃণ রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এই রাস্তার কথা এই বইয়ের গোড়া-তেই বলা হয়েছে। রাস্তাটি পিচ্ছিল রাখার জন্যে তেল ঢালা হতো। নীল নদে ভেলায় ভাসিয়েও পাথর বহন করা হতো।

অনেক বিষয়ে প্রাচীন মিশর উন্নত হলেও তখনও মিশরে চাকা আবিষ্কৃত হয় নি। চাকার ব্যবহার তারা জানতো না। গড়ানে চ্যাপ্টা পাথর দেখেই হোক বা যেভাবেই হোক চাকা যে আবিষ্কার করেছিল সে এক বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী। মিশরীয়রা এই চাকার ব্যবহার জানলে তাদের পাথর পরিবহনের কাজ হয়তো আরও দ্রুত হতো।

পাথরের কোয়ারিতে কোথাও ফাটল দেখলে মিশরীয়রা সেই ফাটলে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দিতো। তারপর সেই গোঁজে ক্রমাগত জল ঢালতো। জলে ভিজে কাঠের গোঁজ ফুলে উঠে ফাটলে জোর চাড় দিতো ফলে ফাটল আরও বাড়তো যার জন্যে পাথরের খণ্ড বার করে আনা সহজ হতো। তারপর সেই পাথরের খণ্ডকে চৌকো করে কাটা হতো।

দেখে মনে হবে পিরামিডগুলি বুঝি বালির ওপরেই তৈরি। তাহলে তো পিরামিড কবেই পড়ে যেতো। বালির নিচে শক্ত মাটি ও পাথর আছে। সেই শক্ত মাটি ও পাথর কেটে ভিৎ খোঁড়া হয়েছে। ভিৎ খুঁড়ে তার মধ্যে জল ঢেলে দেখা হয়েছে সব দিকে জলের গভীরতা সমান কি না। কোথাও জল গভীর হলে সে জায়গা উঁচু করে ভিতরে লেবেল সমান করা হয়েছে। পিরামিডের শীর্ষ থেকে মাটি পর্যন্ত মাপলে দেখা যাবে সব দিক সমান, বড়জোর এক ইঞ্চি তফাত, তাও এত হাজার বছর পরে। গ্রেট পিরামিড তেরো একর জমির ওপর অবস্থিত।

কোয়ারিতে কঠিন পাথরের বড় বড় চাঙড় বার করে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে চৌকস করা তারপর সেই পাথর কাজের জায়গায় পাঠানো। ইতিমধ্যে কাজের জায়গায় হয়তো মূল পিরামিডের ভিৎ খোঁড়া হচ্ছে। খোঁড়ার পর ভিৎ প্রস্তুত ও মূল কাঠামোর কাজ আরম্ভ ও বিরাটাকার আড়াই টন ওজনের একটি ভারি ব্লক ঠিক পজিশনে বসানো। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কত শ্রমিকেরই না প্রয়োজন হয়েছিল।

গ্রেট পিরামিড তো পঁয়তাল্লিশতলা বাড়ির সমান উঁচু। তা সেই উচ্চতা পর্যন্ত পাথরগুলি তোলা হলো কি করে? এই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে সাধারণ বাড়ির মতো পিরামিড খাড়া উঠে যায় নি। তাহলে তো পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হতো। পিরামিডগুলি ত্রিকোণ, গায়ের ঢাল পঞ্চান্ন ডিগ্রি, সেই ঢাল নিখুঁত ভাবে রক্ষা করার জন্যে সতর্কতার সঙ্গে পাথরের ব্লকগুলি বসাবার জন্যে ক্রমশঃ সেগুলি উচ্চে তুলতে হচ্ছে। কাজ মোটেই সহজ নয়। আমরা জানি আমাদের দেশ ওড়িশায় কোনার্কের মন্দির যখন তৈরি হচ্ছিল তখন ভারি পাথরের

মূর্তি ওপরে তোলা একটা সমস্যা ছিল।

কোনার্কের মন্দিরের জন্যে কালো পাথর সংগ্রহ করা হতো খুর্দা অঞ্চল থেকে। পাথরের চাঙড়গুলি ভেলায় করে চন্দ্রভাগা নদী দিয়ে ভাসিয়ে আনা হতো। চন্দ্রভাগা নদী তখন কোনার্কের মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো, এখন দূরে সরে গেছে।

মন্দিরের যেখানে যে মূর্তি বসানো হবে পাথরখণ্ড সেখানে বসিয়ে মূর্তি খোদাই করা হতো। কিন্তু পাথব সেখানে তোলা হতো কি করে? বনিয়াদ থেকে মন্দির হচ্ছে আর তা বালি চাপা দিয়ে বালিয়াড়ি তৈরি করা হচ্ছে। পাথবের খণ্ডগুলি মোটা মোটা কাঠের রোলারের ওপর শুইয়ে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তোলা হতো। পাথর বেশি ভারি হলে, পাথরের নিচে কাঠের রলা থাকলেও ওপর থেকে দড়ি দিয়ে টানা হতো। মন্দির নির্মাণ শেষ হলে বালিয়াড়ি পরিষ্কার করে দেওয়া হতো।

মিশরের পিরামিডে পাথর তোলবার জন্যেও এরকম বালিয়াড়ি তৈরি করা হতো বলে মনে হয় কিংবা পিরামিড ঘিরে ক্রমশ খাড়াই মজবুত একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। সেই রাস্তা দিয়ে পাথর তোলা হতো। পিরামিড তৈরি শেষ হয়ে যাবার পর সেই রাস্তা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। তবে এটা ঠিক যে আড়াই টন ওজনের এক একটি পাথরের ব্লক ওপরে তোলা ছিল কঠিনতম কাজ।

হেরোডোটাস বলেছেন পাথরগুলি তোলা হয়েছিল মেসিনের সাহায্যে। পিরামিডের বয়স তখন দু'হাজার বছর। হেরোডোটাস যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয় তাহলে কি মেসিন? কপিকল? কপিকলে ভারি পাথর তুলতে হলে লিভার ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পিরামিডের কোথাও এমন কি হায়রোগ্লিফিক লিপিতেও লিভারের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সাধারণ মানুষের ধারণা যে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস পিরামিড তৈরি করেছে। চামড়ার চাবুক নিয়ে সর্দার দাঁড়িয়ে থাকতো। কোনো ক্রীতদাস কাজে

ফাঁকি দিলে সর্দার তার চামড়ার চাবুক দিয়ে সপাং সপাং করে মারতো। পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বেরোত। সিনেমাতেও এমন কিছু দৃশ্য দেখা যায়।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টের বুক অফ একজোডাস-এ যদিও উল্লেখ আছে যে-কোনো এক ফারাও বহু সংখ্যক হিব্রু ক্রীতদাস রেখেছিল, কিন্তু এর কোনো পুরাতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া যায় না। পিরামিড তৈরির আমলে কোনো ফারাওয়ের পক্ষে কি লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস রাখা সম্ভব ছিল? সম্ভব হলে সেই লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসকে শাসনে রাখবার জন্যে কয়েক লক্ষ সৈনিক বা সর্দারের অবশ্যই প্রয়োজন হতো। একজন সর্দার চাবুক পেটা করে যাচ্ছে আর শত শত ক্রীতদাস নীরবে তা সহ্য করে যাচ্ছে এমন ঘটনা বিশ্বাস করা যায় না। অহিংসা পরম ধর্ম, এমন বাণী তখনও কেউ প্রচার করে নি।

লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস রাখা ফারাও-এর পক্ষে সম্ভব হতো যদি ফারাও-এর হাতে রিভলভার, রাইফেল বা মেসিন গান থাকতো। এমন একটি আগ্নে-য়াস্ত্র দ্বারা একসঙ্গে অনেককে ভয় দেখিয়ে বশে রাখা যায়।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস বলে পিরামিড তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ শ্রমদানে, স্বেচ্ছাসেবকরা পিরামিড তৈরি করেছে। পাথরের গায়ে শ্রমিক দল নিজ নিজ নাম খোদাই করে গর্ব অনুভব করেছে। "শক্তিমান শ্রমিক দল", "কারুশিল্পীর দল", "সহনশীলের দল" ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মানুষই পিরামিড তৈরি করেছে, দুরূহ এক কাজ প্রাচীন মিশরের মানুষই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করেছে। সেই পিরামিড আজও তাই মানুষেরই জয়গান গাইছে।

বর্তমান যুগেও মানুষের এমন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সংযোগকারী পানামা খাল খননের সময় ইয়োলো ফিভারের আক্রমণে হাজার হাজার শ্রমিক মারা যাচ্ছে। ইয়োলো ফিভার কিসে হয়? মশার কামড়ে? কোন্ মশা? একজন স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এলেন, জেস ল্যাজিয়ার। তিনি মশার দংশন নিয়ে প্রমাণ করলেন যে

স্টেগোমিয়া ফ্যাসিয়েটা নামে মশার দংশনে এই পীত জ্বর হয়। জেস ল্যাজিয়ারেরও পীত জ্বর হয়েছিল কিন্তু সে বাঁচে নি। নিজের প্রাণের বিনি-ময়ে সে হাজার হাজার শ্রমিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ বুঝলেন যে এখানে খাল তৈরি করতে হলে মশা মারতে হবে। তখন ডি-ডি-টি আবিষ্কৃত হয় নি তবে কেরোসিন তেল পাওয়া যেতো। গ্যালন গ্যালন কেরোসিন তেল ঢেলে মশককুল ধ্বংস করা হলো তারপর পানামা খাল তৈরি সম্ভব হলো। মানুষ তার প্রাণের বিনিময়ে এই বিরাট কীর্তি রেখে গেছে।

তেমনি ব্যাধি ও মৃত্যু জয় করে মানুষ একদিন পিরামিড নির্মাণ করলো। ঘরের মেঝেতে যেমন মারবেল বসানো হয় তেমনি পিরামিডের ঢালে আগাগোড়া সাদা লাইমস্টোনের টালি বসিয়ে দেওয়া হলো। পিরামিডের শুভ্র দেহে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে সূর্যালোককে শতগুণ বাড়িয়ে দিত। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বর্তমান কালে পিরামিডকে এমন শ্বেতবর্ণে শুভ্রায়িত করা হয়েছে কি না শোনা যায় নি।

বাইরের সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের সজ্জাও চলছিল। পিরামিডের ভেতরে ফারাও-এর মমি থাকার কথা এবং সেজন্যে প্রকোষ্ঠও তৈরি ছিল কিন্তু মমি নেই। এ এক রহস্য।

এই গ্রেট পিরামিডে দু'টি চেম্বার আছে। ওপরের চেম্বারের নাম কিং'স চেম্বার। এই চেম্বারে ফারাও-এর মমি থাকার কথা। মমি পাওয়া যায় নি তবে চেম্বারে পাথরের তৈরি একটি কফিন পাওয়া গিয়েছিল। কফিনের ওপরে ফারাও-এর মূর্তিও খোদিত ছিল কিন্তু ভেতরে ফারাও-এর মমি ছিল না এবং কফিনের ভেতরে কোনো দিন যে খুফুর কফিন রাখা হয়েছিল তাও জানা যায় নি। চেম্বারে গ্র্যানাইটের তৈরি একটি সিন্দুক পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সিন্দুকের ঢাকাটি পাওয়া যায় নি। সিন্দুকটিও ছিল শূন্য।।

কিংস চেম্বারের নিচে হলো কুইন'স চেম্বার। কিন্তু কুইন'স চেম্বার নাম দেওয়া হলো কেন? কারণ পিরামিডে রাণীদের মমি রাখা হতো না।

আরবরা যে প্রকোষ্ঠে মহিলাদের সমাধি দিতেন সেই প্রকোষ্ঠের ছাদের ভেতরে যে কার্নিশ নির্মিত হতো পুরুষদের সমাধি-প্রকোষ্ঠের ভেতরে ছাদের নিচে নির্মিত কার্নিশ অপেক্ষা কিছু পার্থক্য থাকতো। তাই কিং'স চেম্বারের নিচে যে প্রকোষ্ঠ বা চেম্বার ছিল সেই চেম্বারের কার্নিশের বিশেষ গঠন লক্ষ্য করে কুইন'স চেম্বার নাম দেওয়া হয়েছিল। কুইন'স চেম্বারে আর একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পুব দিকের দেওয়ালে বেশ বড় একটা খাঁজ ছিল। কেন এই খাঁজ করা হয়েছিল বলা না গেলেও অনুমান করা যায়, এর মধ্যে প্রস্তরনির্মিত একটি কফিন সোজা দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারতো। হয়তো সেইজন্যেই দেওয়ালে ঐ খাঁজটা করা হয়েছিল।

ঘরখানির দৈর্ঘ্য আঠারো ফুট প্রস্থও আঠারো ফুট। হয়তো মৃত্যুর পর ফারাও-এর জন্যে উপকরণাদি সাজিয়ে রাখবার জন্যে এই প্রকোষ্ঠ তৈরি করা হয়েছিল তবে রাণীর মমি এই প্রকোষ্ঠে রাখা হয় নি। এই পিরামিডে ফারাও খুফুর মমিও পাওয়া যায় নি, তার মমি যে রাখা হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অনুরূপভাবে রাণীর মমি যে এই ঘরে কখনও রাখা হয়েছিল তারও বিন্দুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

গ্রেট পিরামিডের ভেতর মূল্যবান কোনো সামগ্রী পাওয়া যায় নি কেন? কারণ আর কিছু নয়। কবর-দস্যুরা নিয়মিত লুঠপাট করত; একমাত্র টুটানখামেনের পিরামিড রক্ষা পেয়েছে যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়। এই পিরামিড থেকেও দস্যুরা কিছু সরিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে সীল করে দিয়েছিল।

মিশরের ইতিহাসে যে সময়টা ফার্স্ট ইন্টারমিডিয়েট পিরিয়ড নামে পরিচিত সেই সময় পিরামিডগুলিতে অবাধ লুঠপাট চলেছিল। প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতনের পর দীর্ঘ একশত চল্লিশ বছর ধরে প্রাচীন মিশরে দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়েছিল যার জন্য পিরামিডগুলি অব্যাহতি পায় নি। লুঠপাটের পর মিশরে যা পাওয়া গিয়েছিল তা দেখেই বোঝা যায় প্রাচীন মিশরের সভ্যতা কত উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী ছিল। এত বেশি

।পরিমাণে সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আর কোনো দেশে পাওয়া যায় নি।

মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক কিন্তু মিশরের তুলনায় মহেঞ্জোদাড়ো তথা সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন অল্পই পাওয়া গেছে।

পিরামিডগুলি রত্নের আধার এমন কিংবদন্তী রোম সাম্রাজ্য পতনের পরও প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট পরবর্তী নবম শতকে আরবে আল মামুন নামে একজন দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী দলবল নিয়ে লুঠপাট করে বেড়াতো। পিরামিডের কথা সেও শুনেছিল এবং তার ধারণা হয়েছিল যে এটি একটি রত্নাগার। অতএব যে করে হোক ভেতরে ঢুকতেই হবে। কিন্তু ঢুকবে কোন্‌দিক দিয়ে? ঢোকবার কোনো পথ তো পাওয়া যাচ্ছে না। গ্র্যানাইট ব্লকের ওপর লাইমস্টোনের যে আবরণ আছে তাদের ছেনি দিয়ে তাই কাটা যাচ্ছে না তারপর তো আছে আরও ভারি পাথরের ব্লক।
আল মামুন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার মানুষ নয়। সে কোথা থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিনিগার যোগাড় করে পাথরের ওপর ঢেলে কাঠকাঠরা চাপিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলো। প্রচণ্ড আগুনের তাপে পাথর ফেটে গেল। ফাটা পাথর সরিয়ে অনেক পরিশ্রম করে মামুন একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়লো। নেহাৎ ছোট সুড়ঙ্গ নয়, একশত ফুট দীর্ঘ। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে মামুন তার দলবল নিয়ে পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করলো কিন্তু হায়! সমস্ত প্রকোষ্ঠই শূন্য, কিছুই নেই। আরব্য উপন্যাসে আল মামুনের এই কাহিনীর বিবরণ আছে।
মামুন সত্যিই কি পিরামিডের ভেতর থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিল? সে শুনেছিল একটি পিরামিডের ভেতরে আছে তিরিশটি প্রকোষ্ঠ এবং প্রতি প্রকোষ্ঠ মূল্যবান সামগ্রীতে পূর্ণ। কেউ বলে মামুন চোখ ঝলসানো নানা সামগ্রী লুঠ করেছিল, কেউ বলে সে কিছুই পায় নি, কিন্তু পাছে তার দলের লোকেরা বিদ্রোহ করে বসে সেই ভয়ে মামুন নিজের পকেট থেকে তাদের টাকা দিয়ে শান্ত করেছিল।

গ্রেট পিরামিডের গায়ে আল মামুন আঘাত হানার কয়েক শতক পরে। ওকে আবার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। কায়রোর কাছে মুসলমানরা পিরামিডের ওপর থেকে লাইমস্টোনের আবরণী পাথরগুলি খুলে নিয়ে গিয়ে মসজিদ তৈরি করেছিল। সুন্দর কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ আজও কায়রোর কাছে দেখা যায়, যাদের দেওয়ালে বসানো আছে পিরামিডের আবরণী সেইসব লাইমস্টোনের পাথর।

লাইমস্টোনের আবরণগুলি তুলে নেওয়ার ফলে পিরামিড হয়ে আছে হতশ্রী। গ্র্যানাইট পাথরের খাঁজ বেরিয়ে পড়েছে। খাঁজে পা দিয়ে বেশ ওপরে ওঠা যায়।

'মাদাম বোভারি' উপন্যাসের লেখক গুস্তাফ ফ্লবেয়ার (১৮২১-১৮৮০) লিখেছেন : ভ্রমণপিপাসু যখন পিরামিডের চূড়ায় উঠলেন তার হাত ও হাঁটু ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে, তার চারদিকে মরুভূমি, প্রচণ্ড রোদ আর বাতাস এত জোরে প্রবাহিত যে মনে হয় ফুসফুস বুঝি ফেটে যাবে। প্রখর রৌদ্রালোকে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ভীষণ গরম, ক্লান্ত সেই পথিককে অবশ হয়ে কঠিন ও তপ্ত পাথরের ওপর আশ্রয় নিতে হয়, চারদিকে মৃত পাখির স্তূপ। এরই মধ্যে অর্ধমৃত সেই হতাশ পথিককে বিশ্রাম নিতে হয়।

পিরামিডে ওঠার অভিজ্ঞতার বিবরণ ফ্লবেয়ার এইভাবে দিয়েছেন কিন্তু তিনি তখনও পিরামিড দেখেন নি। এ তাঁর কল্পনা মাত্র। তবে পিরামিড তিনি দেখেছিলেন চার বছর পরে।

অধ্যাপক বব ব্রায়ার লিখছেন : ফ্লবেয়ারের এই বর্ণনা পড়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলুম কিন্তু একদিন কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আমি সত্যিসত্যিই পিরামিডের শীর্ষে পৌঁছলুম তখন আমরা সকলে কিছু ক্লান্ত হয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু কারও হাত পা ছড়ে যায় নি। ফ্লবেয়ারের পথিক মৃত পাখির স্তূপ দেখেছিল, আমি কিন্তু মৃত দূরের কথা একটা জীবিত পাখিও দেখতে পাই নি তবে বিস্মিত হয়েছিলুম পিরামিডশীর্ষে উটের বিষ্ঠা দেখে। এই

বস্তুটি এখানে কি করে এলো ?

যেদিন সন্ধ্যায় কায়রোয় পৌঁছলুম সেদিন অন্ধকারে আমার প্রথম পিরামিড দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছি কিন্তু পরদিন দিনের আলোয় পিরামিড দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত। কি করব আমি স্থির করতে পারছি না। পিরামিড প্রদক্ষিণ করব নাকি শীর্ষে আরোহণ করবো নাকি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় কোথায় ? ভারতের তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতো দালালদের দল ছেঁকে ধরবে, কেউ বলবে একমাত্র সেই পিরামিডের ওপরে নির্ঝঞ্ঝাটে নিয়ে যেতে পারবে আর একজন বলবে সেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য গাইড যে পিরামিড দেখাতে পারে। ওদিক থেকে কয়েকজন উট নিয়ে এগিয়ে আসবে, ক্যামেরা হাতেও কয়েকজন, বলবে উটের ওপর উঠে বোসো, পিছনে বা পাশে তোমার পিরামিড, কি দারুণ ফটো উঠবে, দেশে গিয়ে দেখাবে, তুমি যে পিরামিডে এসেছ তার প্রমাণ।

তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে কিউরিও বিক্রেতার দল, তারা বলবে, পিরামিডে এলে আর কিছু কিউরিও নিয়ে যাবে না ? একেবারে আসলি চিজ, জেনুইন অ্যান্টিকুইটি, কাম স্যার ম্যাডাম স্যার ভেরি চিপ।

ফারাওদের মমিদের আশেপাশে তাদের সেবক, সূপকার বা ভৃত্যদের ছোট ছোট মূর্তি সাজিয়ে দেওয়া হতো। এইসব মূর্তি ধাতু, পাথর বা মাটির তৈরি। এগুলিকে বলা হয় 'উসাবতি', মিশরীয় ভাষায় যার অর্থ ভৃত্য।

ওরা এই পুতুল সাজিয়ে নিয়ে আসে, বোঝাবার চেষ্টা করে এগুলি ঘরে রাখলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়, বাড়িতে কোনো রোগ ঢুকতে পারে না। সে যাই হোক, ছোট ছোট পুতুলগুলি দেখতে পুরনো হলেও সব ঝুটো। কুটিরশিল্প হিসেবে ঐসব 'অ্যান্টিকুইটি' তৈরি হচ্ছে। এক শ্রেণীর দরিদ্র মানুষ কিছু রোজগার করছে।

গ্রেট পিরামিডের ভেতরে ভ্রমণকারীদের যেতে দেওয়া হয় কিন্তু ভ্রমণ-

কারীদের ভেতরে যাবার জন্যে নতুন কোনো প্রবেশপথ তৈরি করা হয় নি। নবম শতাব্দীতে দস্যু আল মামুন পিরামিডের দেওয়াল ভেঙে যে পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল সেই পথ দিয়েই ঢুকতে হয়।

বর্তমানে পিরামিডের ভেতরে বিজলীবাতি জ্বলছে অতএব ভালো করে দেখার পক্ষে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু মশাল বা মোমবাতি জ্বেলে যারা ভেতরে প্রবেশ করতো তারা যে কেউ আতংকগ্রস্ত হতো না এ কথা জোর করে বলা যায় না। কোথায় কোন্ কোণে কি লুকিয়ে আছে, অশরীরি আত্মারা হঠাৎ অলৌকিক কিছু করে বসে যদি, এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয় কিছু শংকা থাকতো।

বর্তমানে বিজলীবাতি জ্বললেও কয়লার খনিতে নামলে যাদের ভয় করে তাদের পিরামিডে প্রবেশ না করাই ভালো। তারা ভয় পেতে পারে।

কিংস চেম্বারে যেতে হলে একটা দেড়'শ ফুট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে হয়। সুড়ঙ্গটা ওপর দিকে উঠেছে ছাব্বিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে অসুবিধে হতো না যদি নাকি ওটি প্রশস্ত হতো। কিন্তু তা নয়, মাত্র চার ফুট চওড়া ও চার ফুট উচ্চ। সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না তাহলেই মাথা ঠুকবে। কোমর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে উঠতে হয়। যাদের কোমরে বাত আছে তাদের পক্ষে কিংস চেম্বারে যাওয়া সম্ভব নয়। মেঝেটা মসৃণ নয় তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না।

সুড়ঙ্গ শেষ হলেই আরম্ভ হচ্ছে গ্র্যাণ্ড গ্যালারি। নাম শুনে যে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে আসল ব্যাপারটা তা নয়।

এটিও একটি ছাব্বিশ ডিগ্রি সুড়ঙ্গ তবে ঢালু। এটিও চার ফুট চওড়া তবে উচ্চতা আঠাশ ফুট, মাথা ঠোকবার ভয় নেই। এই সুড়ঙ্গও আগেকারটির মতো দেড়শ ফুট দীর্ঘ। এই দু'টি সুড়ঙ্গ কি উদ্দেশ্যে এবং কেন তৈরি করা হয়েছিল তা বলা কঠিন। নানা জনের নানা মত।

সুড়ঙ্গ শেষে হঠাৎ তিন ফুট খাড়াই এবং তারপর আর ঢালু নয় তবে উচ্চতা কমে গেছে প্রায় চার ফুট। এই বুঝি গ্র্যাণ্ড গ্যালারি। দশ ফুট

পার হলে একটি পার্শ্বকক্ষ বা উপকক্ষ এবং তারপর কিংস চেম্বার।
একটা জিনিস অনেক দর্শকের নজর এড়িয়ে যায় সেটি হলো অগভীর কিন্তু বেশ বড় একটি গর্ত, এই গর্তে থাকতো একটি নৌকো। ফারাওদের কবরস্থ করবার সময় নৌকোটি রাখা হতো নচেৎ ফারাও পরলোকে যাবেন কি করে? প্রাচীন মিশরীয়রা নৌকো করেই যাতায়াত করতো, পাশেই তাদের নীল নদ। মরুবাসী বা যাযাবরদের মতো তারা উটের পিঠে চেপে স্থানান্তরে যেত না।
নৌকোগুলি কিন্তু পিরামিডের ভেতরে রাখা হতো না, সেগুলি পিরামিডের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হতো। গ্রেট পিরামিডের বাইরে পৃথক পৃথক স্থানে পাঁচটি গর্ত বা বোট পিট-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। পাঁচটি বোট পিট-এর মধ্যে দু'টি প্রায় বুজে গেছে। বাকি তিনটিতে কিছু পুরনো কাঠ এবং দড়ির টুকরো পাওয়া গিয়েছিল।
ওগুলি যে সত্যই বোট পিট তার প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে খনন কাজ চালাবার সময় পিরামিডের দক্ষিণ দিকে আরও দু'টি বোট পিট আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেগুলির মুখ তখনও বন্ধ ছিল। প্রবেশ পথ পনেরো টন ভারি লাইমস্টোন পাথরের ব্লক দিয়ে বন্ধ করা ছিল। যন্ত্র চালিয়ে অর্থাৎ ড্রিল করে পাথরের ব্লক ফুটো করে ভেতরে নৌকোর টুকরো দেখা গিয়েছিল। পাথরের ব্লক সরিয়ে নৌকোর যে সব অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলির সাহায্যে ১২০ ফুট দীর্ঘ একটি চমৎকার নৌকো তৈরি করাও গিয়েছিল। বায়ুবিহীন ও শুষ্ক প্রকোষ্ঠে থাকার জন্যে নৌকোর অংশগুলি সাড়ে চার হাজার বছরেও নষ্ট হয় নি। এটা ঠিক যে খুফু এই নৌকোয় কোনো দিন চড়েন নি এবং এই নৌকোয় চেপে পরলোকে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তাহলে তো নৌকো এখানে থাকবার কথা নয়।
আর একটা বোট পিট খোলা হয় নি। ওর ভেতরে যে নৌকোটি আছে সেটি হয়ত খুফু তাঁর জীবিতকালে ব্যবহার করতেন।
গ্রেট পিরামিড ও অন্যান্য পিরামিড সম্বন্ধে আমার উত্তম রূপে পড়া ছিল।

কোথায় কোন্ বস্তুটি আছে, কোন্ ঘরের পর কোন্ ঘর ইত্যাদি সবই আমার জানা ছিল শুধু চাক্ষুষ দেখা হয় নি। এখন চাক্ষুষ দেখে আমি সব মিলিয়ে নিলুম।

পিরামিড থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবার পর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বললো তারা ওপরে উঠতে চায়। আমি নিজেও ওপরে উঠতে চাই। আমাদের মতলব শোনা মাত্রই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তিরা আমাদের বার বাব নিষেধ করতে লাগলো। তারা বললো, ওপরে ওঠা বেআইনী তো বটেই এমন কি বিপজ্জনক। গত বছর একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ওপবে উঠতে গিয়ে পড়ে মারা গিয়েছেন।

আমরা ওদের কথা গ্রাহ্য করলুম না। দেখে তো মনে হচ্ছে বিপজ্জনক কিছু নেই তবে পাথরের পর পাথরের ধাপ ভেঙে ওপরে ওঠা কষ্টকর। কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করা যায়, আমরা যখন উপযুক্ত স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন একজন সুদর্শন নীলাক্ষি আরব গাইড এসে বললো তাব নাম শেদ্দি, সে এমন পথ দিয়ে আমাদের ওপরে নিয়ে যেতে পারে যেদিক দিয়ে উঠলে পরিশ্রম কম হবে।

আমি শুনেছি গাইডদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে গাইডদের রেট বাঁধা আছে কিন্তু পিরামিডের ওপরে ওঠবার জন্যে কোনো রেট নির্ধারিত নেই। সেজন্যে শেদ্দিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম সে কত চায়।

অম্লান বদনে সে বললো মাথাপিছু দশ ডলার দিতে হবে কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত আমাদের পুরো দলটার জন্যেই শেদ্দি দশ ডলারে রাজি হলো এবং সকলে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলে তাকে মোটা বখসিশ দিতে হবে। আমরা রাজি।

আমার দলের সকলে ওপরে উঠতে রাজি হয় নি। আমরা যখন ওপরে উঠব তারা তখন উটের পিঠে চেপে এদিক ওদিক একটু বেড়াবে। উটের পিঠে চড়াও তো একটা অভিজ্ঞতা।

যদিও শেদ্দি আমাদের বললো যে ওপরে উঠে নিচে নেমে আসতে বেশি

সময় লাগবে না কারণ ওপরে ওঠবার রেকর্ড টাইম হচ্ছে মাত্র সাত মিনিট, কিন্তু আমি অনুমান করলুম মোটমাট দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। পাথরের ব্লকগুলি বেশ বড়, উঠতে বেশ কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়। এজন্যে আমরা আস্তে আস্তে উঠছিলুম যাতে না আমরা বে-দম হয়ে যাই, তবুও মাত্র দশটি পাথর অতিক্রম করেই আমার একজন ছাত্রী রণে ভঙ্গ দিল, সে আর পারছে না, নিচে নেমে যাবে। আরও কয়েক ধাপ ওঠবার পর আরও দু'জন হার স্বীকার করে বললো তারা আর উঠতে পারছে না, তারা এখানে অপেক্ষা করবে।

বাকি রইলুম আমরা চার জন এবং আমাদের গাইড শেদ্দি। আমিই প্রথমে চূড়োয় উঠলুম এবং হাত ধরে বাকি তিনজনকে উঠতে সাহায্য করলুম। এখান থেকে সোজাসুজি নিচে পড়ে যাবার ভয় নেই, পড়লেও পাথরের ধাপে আটকে যেতেই হবে, তিন ফুট অন্তর অন্তর পাথরের খাঁজ পড়ন্ত মানুষকে আটকে দেবে তবে কঠিন পাথরের ওপর পড়ে যাওয়াটা নিশ্চয় আরামদায়ক হবে না।

ছবিতে আমরা সাধারণত দেখি পিরামিডের চূড়ো ছুঁচলো কিন্তু এই পিরামিডের মাথা ফ্ল্যাট, কারণ চূড়ো থেকে অনেক পাথর কোনোভাবে অদৃশ্য হয়েছে তাই গ্রেট পিরামিডের মাথাটা ফ্ল্যাট, কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট বেশ একটা চৌকো জায়গা আছে। সেখানে বিশ্রাম নেওয়া এবং চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, আরও কয়েকটি পিরামিড এবং অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আমরাও দেখলুম। কাছেই তো কেফ্রেন পিরামিড আর দূরে দাশুরে দেখা যাচ্ছে বেণ্ট পিরামিড। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে গ্রেট স্ফিংক্স-এর বিচিত্র মূর্তিটা, যার দেহ সিংহের মতো, মাথা মানুষের মতো। বিরাট মূর্তি। আরও কয়েকটি স্ফিংক্স মূর্তি থাকলেও এইটিই সবচেয়ে বড়। কেফ্রেন তার পিরামিড তৈরি করবার সময় এই নরসিংহ মূর্তিটিও তৈরি করিয়েছিল। নির্মাণের সময় ধরা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৬৫ বছর থেকে ২৫৪২ বছরের মধ্যে।

যেখানে এই নরমূর্তিটি রয়েছে সেখানেই নাকি বিরাট একটি স্যাণ্ডস্টোন পড়ে ছিল। সেই স্যাণ্ডস্টোনটি খোদাই করে এই বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়েছে যা হলো সিংহের মতো শক্তিমান ও পরাক্রমশালী রাজার প্রতীক।

গ্রেট স্ফিংক্সের মূর্তির পায়ের কাছে একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়েছিল। ফারাও কেফ্রেনের হাজার বছর পরে যিনি ফারাও ছিলেন তাঁর নাম চতুর্থ টুথমোসিস। তিনি ফারাও হওয়ার পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের বিবরণ এই প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ করা আছে।

এই হাজার বছরের মধ্যে গ্রেট স্ফিংক্স বালিতে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ওর অস্তিত্বই কেউ জানতো না। যুবক টুথমোসিস একদা শিকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঐ বালির স্তূপের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখে যে এক নরসিংহ মূর্তি তাকে যেন বলছে সে এই বালির নিচে চাপা পড়ে আছে, যুবক যদি বালি সরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারে তাহলে যুবক মিশরের ফারাও হবে। টুথমোসিস বালি সরিয়ে অবাক। সত্যিই একটি নরসিংহ মূর্তি পাওয়া গেল ঠিক যেমনটি সে স্বপ্নে দেখেছিল। যুবক টুথমোসিস ফারাও হয়েছিল। এই ঘটনা স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই নরসিংহের পদতলে টুথমোসিস প্রস্তরলিপিটি স্থাপন করেছিল।

হালে এই স্ফিংকসের কঠিন রোগ হয়েছে। বৃদ্ধ হয়েছে তো! প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে রোদ বৃষ্টি ঝড় এবং ইদানিং ডিজেলের ধোঁয়া উপেক্ষা করে সে পিরামিডকে পাহারা দিয়ে আসছে।

তার গলা ও দেহ থেকে 'মাংস' খসে পড়ছে। সত্যিই কি আর মাংস? তা নয়। যে সামগ্রী দিয়ে তৈরি সেই সামগ্রীই খসে খসে পড়ছে। থাবাও আক্রান্ত। ওপরের স্তর গুঁড়ো গুঁড়া হয়ে যাচ্ছে।

রোগের কারণ কি?

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন পুরনো যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, চিরকাল কোনো কাঠামো অক্ষত থাকা সম্ভব নয়। সেই ফারাওদের আমল থেকে

এর চিকিৎসা চলে আসছে। সেকালে যে-সব মালমসলা দেওয়া হয়েছিল সেই মালমসলা অর্থাৎ 'মলম' উপযুক্ত বা সঠিক হয় নি। তার প্রতিক্রিয়া এখন দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন ও পরবর্তী মসলায় সংঘাত ঘটেছে।

অধুনা আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। অনতিদূরে আছে মিশরের বিখ্যাত আসোয়ান বাঁধ, বিরাট জলাধার। এর ফলে পিরামিড অঞ্চলে জমির নিচে জলস্তর অনেক উঠে গেছে। জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এজন্যে বৃদ্ধ স্ফিংকসকে আজকাল 'সর্দি কাশিতে' ভুগতে হচ্ছে।

মোটরযান ও বিমানের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। কায়রোতেও কলকারখানা বেড়েছে, বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। এইসব নানা কারণে স্ফিংকসকে রোগে ভুগতে হচ্ছে।

চিকিৎসা অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে। তবু অনেকে বলছে ওকে বালি চাপা দিয়ে দাও। তাইতেই ওর ক্ষয় বন্ধ হবে, রোগ সারবে।

কায়রোর বনেদী খবরের কাগজ আল আহ্‌রাম চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। আল আহ্‌রাম ক্রমাগত বলছে, স্ফিংকসের কি রোগ সরকার তা আমাদের স্পষ্ট করে বলছেন না। আমাদের ভয় রোগ না হাতের বাইরে চলে যায়।

সরকার অর্থাৎ মিশরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঠিক চুপ করে বসে নেই। তারা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করছে কি করে অতিবৃদ্ধ স্ফিংকসকে অক্ষয় পরমায়ু দেওয়া যায়। আপাতত তিরিশ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করা হয়েছে। মিশরের পার্লামেন্টেও বৃদ্ধের রোগ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। টেলিভিসন মারফত জনাব মনসুর হাসান আশ্বাস দিয়েছেন, অবিলম্বে ভয়ের কিছু নেই। বুড়ো হাড় অনেক মজবুত। না, তার ক্যানসার হয় নি তবে যে দুষ্ট ক্ষত হয়েছে তা সারানো যাবে।

ভূগর্ভে জলস্তর উঠে যাওয়ার ফলে নিকটবর্তী আবু সমবেল মন্দিরটি বিপদে পড়েছিল। আশংকা হয়েছিল মন্দিরটি বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু সুইডেনের একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফারম বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় মন্দিরটিকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছে। সুইডেনের সেই এঞ্জিনিয়ারিং ফারমকে

স্ফিংকসকে বাঁচাবার ভার দেওয়া হয়েছে। তারা এখনও রোগ নির্ণয় করে নি। রোগ নির্ণীত হলেই চিকিৎসা আরম্ভ হবে।
একজন ইউরোপীয় এক্সপার্ট সতর্ক করে দিয়েছেন, দেখো বাপু রোগ অপেক্ষা ওষুধ যেন কড়া হয়ে যায় না।
স্ফিংকসের এই বিপদ দেখে আমাদের তো তাজমহলের জন্যে আশংকা হচ্ছে। পিরামিড তুল্য প্রাচীন না হলেও এবং ভেতরে কাদার গাঁথনি থাকা সত্ত্বেও সে কয়েকশত বৎসর যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তাজও ঝড় তুফান, রোদ ও বন্যা এতদিন তুচ্ছ করে এসেছে কিন্তু আর বুঝি পারবে না। কয়েক মাইল দূরেই তো বসানো হচ্ছে পেট্রল রিফাইনারি। বিশেষজ্ঞেরা যতই আশ্বাস দিন তাঁরা কি বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়া থেকে তাজকে বাঁচাতে পারবেন?
তাজের বাইরেও মোটরযান ও ডিজেলের ধোঁয়ার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। তাজের শুভ্রতা কমে যাচ্ছে। মারবেলের ওপর ঘসামাজা করে কি মলিনতা রোধ করা যাবে?
তাজ স্ফিংকসের মতো অত মজবুত নয়, অনেক কোমল। সে কি আর ধকল সহ্য করতে পারবে? সেদিন কে যেন বলছিলেন যে বায়ুমণ্ডল দূষিত (এয়ার পলিউশন) হওয়ার ফলে কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমো-রিয়াল অনেক ম্লান হয়ে গেছে!
আশার কথা কুড়ি বছর পরে পৃথিবীর যাবতীয় পেট্রল সম্পদ নাকি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন যদি তাজের মতো প্রাচীন কীর্তিগুলি বেঁচে যায়!
গ্রেট পিরামিডের চূড়ো থেকে কেফ্রেন ও বেণ্ট ব্যতীত তিনটে গিজেপিরা-মিড দেখা যায়। তিনটের মধ্যে ছোটটির নাম মাইসেরিনাস পিরামিড। সবচেয়ে ছোট? কত ছোট?
মিশরীয় ঐতিহাসিক আবদুল অল লতিফ লিখেছেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন খালিফ স্থির করলেন পিরামিডগুলি ভেঙে ফেলবেন। সারা দেশ থেকে তিনি অনেক শ্রমিক সংগ্রহ করে মাইসেরিনাস পিরামিডটি

ধ্বংস করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। আট মাস ধরে অবিরাম কাজ চললো, কিছু পাথর খুলে জমা করে রাখবার সময় খালিফ ভাবলেন এত পাথর কোথায় রাখবেন ?

গত আট মাস অনেক চেষ্টা করে যেটুকু পাথর খসিয়ে জমা করা গেছে তাতেই তো একটা পাহাড় হয়ে গেছে। অতএব ও যেমন আছে তেমন থাক। ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। ঘুরে ঘুরে একজায়গায় দেখলে মনে হবে যে পিরামিডটি ভাঙবার একটা চেষ্টা হয়েছিল বটে।

মিশরের ওল্ড কিংডম বংশের পরই পিরামিড তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেন ? জোর করে কিছু বলা যায় না। সম্ভবতঃ কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকারের অভাব।

বব ব্রায়ারের বিবরণী এখানেই শেষ হয়েছে তবে এরপর আমরা আর একজনের বিবরণী পড়বো কারণ তাঁর লেখা থেকেও আমরা কিছু পিরামিড তথ্য পাবো।
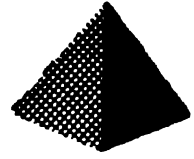
পিরামিডের ছায়ায় বিশ বছর

৪

ক্যাপটেন জেমস কিনিয়ারের জন্ম নিউজিল্যাণ্ডে। চাকরি নিয়ে ১৯২৮ সালে তিনি কায়রো গিয়েছিলেন। কায়রোতে এক পুস্তক প্রকাশন সংস্থায় জেমস কিনিয়ার চাকরি করতেন। এই প্রকাশন সংস্থা প্রধানতঃ শিক্ষামূলক প্রবন্ধের বই ও গবেষণামূলক বই প্রকাশ করতেন তবে অধিকাংশই আরবী ভাষায়। নিউজিল্যাণ্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চাকরিতে ছেদ পড়ে তবে যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি মধ্য প্রাচ্যেই ছিলেন, প্রথমে ব্রিটিশ আরব ব্যাটালিয়নে এবং পরে কায়রোতে ব্রিটিশ এমব্যাসিতে।

ক্যাপটেন জেমস কিনিয়ার পিরামিড ও মিশরের ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন। পিরামিড ও মিশর সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁরই মুখ থেকে কিছু শোনা যাক। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখছেন :

পিরামিড দেখার উদ্দেশ্যে আমি যখন নিউ জিল্যাণ্ডে জাহাজে উঠি তখন আমার বয়স তিরিশও হয় নি। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে অকল্যাণ্ডে আমি নিউজিল্যাণ্ড শিপিং লাইনের একটি জাহাজে উঠি। অকল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ টাসমান সাগর পার হয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে পেঁছে হিসেব করে দেখলুম আমি ইতিমধ্যে বারোশ' মাইল অতিক্রম করেছি। কায়রো এখনও অনেক দূর।

সিডনিতে জাহাজ বদল করতে হলো। যে জাহাজে এলুম সে জাহাজ আর যাবে না। সেকালের বিখ্যাত ব্রিটিশ কোম্পানি পি অ্যাণ্ড ও লাইনারের

জাহাজে উঠলুম। এ জাহাজ যাবে ইংলণ্ডের সাদাম্পটন বন্দর পর্যন্ত। তবে আমি নামবো সুয়েজ ক্যানেলের উত্তরে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে। পোর্ট সৈয়দ পৌঁছে আমি ট্রেনে চাপলুম। এবং অবশেষে কায়রো পৌঁছলুম। মোটমাট আঠাশ দিন লাগলো। এখন তো বিমান হয়েছে, নিউজিলাণ্ড থেকে ইজিপ্ট পৌঁছতে পুরো দু'দিনও লাগে না, কত সময় বাঁচে।

কায়রো পৌঁছলুম রাত্রি ন'টায়। এখানেই আমাকে কয়েক বছর থাকতে হবে। প্রাচীন নবীন, ধনী দরিদ্র মিলিয়ে, এই শহর যে শহরের একাংশে এলে মনে হবে অতি পরিচ্ছন্ন শহব এবং অপর অংশে প্রবেশ করলে মনে হবে বুঝি এমন নোংরা শহর আর নেই। পৃথিবীর সব পুবনো শহরই বুঝি এইরকম।

যে পাড়ায় আমাকে থাকতে দেওয়া হলো সে পাড়ার নাম শারিয়া অল-মানাখ যার অর্থ উটেদের হাঁটু গেড়ে বসবার জায়গা। এককালে এই অঞ্চলে বোধহয় উট ভাড়া পাওয়া যেত মাল বা মানুষ বইবার জন্যে তাই এই নাম। মোটব গাড়ি ও লরির যুগ শুরু হওয়ায় এ পাড়া থেকে উট অদৃশ্য হয়েছে।

পরদিন শহরটা ঘুরে বেড়ালুম। ফারাও-এর কন্যা নীলনদের ধারে নলবনে যেখানে ভাসমান শিশু মোজেসকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেই অতি প্রাচীন জায়গা যেমন দেখলুম তেমনি দেখলুম শহরের বিখ্যাত খবরের কাগজ 'আল আহ্‌রম-'এর অফিস। শব্দটির অর্থ পিরামিড। আমেরিকান ইউনি-ভারসিটি ভবনও দেখলুম। ভাষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এখানে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল।

গোড়ার দিকে শহর ঘুরতে ঘুরতে আমি লক্ষ্য করলুম যে এখানে আরব এবং কপ্ট ক্রীশ্চানরা একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে, কোনো বিরোধ নেই। কপ্টদের চেনা যায় তাদের গায়ের ও চোখের রং দেখে। আরবদের চেয়ে তারা একটু ফর্সা এবং চোখের তারার রং বাদামী।

মিশরে মুসলমানদের আগমন ৬৩২ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। কপ্টরা তার বহু আগে থেকেই মিশরে বসবাস করত। এদেরই পূর্বপুরুষ পিরামিড নির্মাণ

করেছে। শব্দটির উৎপত্তি 'কিপ্ট' অথবা 'জিপ্ট' থেকে। বোঝা যায় কিপ্ট থেকে কপ্ট শব্দ এবং জিপ্ট থেকে ইজিপ্ট শব্দের উৎপত্তি। তবে ইজিপ্টে এরাই এখন সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ফারাও তৃতীয় থুটমোসের সময় নীল উপত্যকা থেকে হিব্রুদের (ইহুদী) তাড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ওল্ড টেস্টামেণ্টে কোথাও ফারাও-এর নামের উল্লেখ নেই। সেকালে যাঁরা ইতিহাস লিখতেন তাঁরা বোধহয় রাজার গুণগানই করতেন, কুকীর্তি উল্লেখ করতেন না। পিরামিড তখন নির্মিত হয়েছে কিন্তু তারও উল্লেখ নেই তবে একটা 'টাওয়ার অফ সাইরিন' নাম বাইবেলে পাওয়া যায়।

প্রথম যেদিন পিরামিড দেখলুম সে দিনটা আমার স্মরণীয় হয়ে আছে। শহর থেকে ট্যাকসিতে যেতে সময় লাগলো কুড়ি মিনিট, বাসে গেলে ডবল সময় লাগতো। পিরামিডে প্রচুর গাইড বা ড্র্যাগাম্যান পাওয়া যায়। এরা ইংরেজি, ফরাসি, ইটালিয়ান ইত্যাদি ভাষা জানে। অনেক ভ্রমণকারী পিরামিড পিছনে রেখে উটের পিঠে চেপে ফটো তোলায়।

সর্বাপেক্ষা বড় ও উচ্চতম হলো চিয়পস পিরামিড। এর ওপরে উঠতে দেওয়া হয় কিন্তু ওঠা ও নামা বেশ দুরূহ। পরবর্তী বৃহত্তম হলো কেফ্রেন পিরামিড। এর চূড়োটি এখন ছুঁচলো আছে এই চূড়োয় এখনও লাইমস্টোন ব্লক-গুলি বসানো আছে, রৌদ্রকিরণে ও চন্দ্রকিরণে চিকচিক করে। চিয়পস পিরামিডের মাথা থেকে অনেক পাথর যে কোথায় গেল কে জানে এবং এজন্যেই এর মাথায় বেশ খানিকটা জায়গা টেবিলের মতো সমান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পিরামিডে ওঠা নিষিদ্ধ ছিল। আদেশ অমান্য করে দু'জন মার্কিন সৈন্য পিরামিডে উঠেছিল। পা ফসকে পড়ে গিয়ে দু'জনেই মারা যায়। এখন যদিও ওপরে ওঠবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলেও আমি বলবো যাদের স্বাস্থ্য দুর্বল বিশেষ করে ফুসফুস যদি দুর্বল হয় তাহলে ওপরে ওঠবার চেষ্টা না করাই ভালো।

এই পিরামিডের উচ্চতা ৪৮০ ফুট উঁচু। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড

যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিলেন তখন তিনি হাতে গলফ্ খেলবার স্টিক বা ক্লাব এবং পকেটে কয়েকটা গলফ্ বল নিয়ে পিরামিডের চূড়োয় উঠেছিলেন এবং সেখানে গলফ্ বল রেখে গলফ্ ক্লাব দিয়ে আঘাত করে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন দেশে ফিরে আমি গর্ব করে বলতে পারবো যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ টী (যেখানে বল রেখে আঘাত করা হয়) থেকে গলফ্ বল মেরেছি।

পিরামিডের চূড়ো থেকে চারদিকের দৃশ্য ভারি চমৎকার। এধারে ওধারে ছোট বড় পিরামিড ও ধ্বংসাবশেষ ছাড়া দেখা যায় কায়রোর লম্বা লম্বা বাড়িগুলো আর বাড়ি ছাড়িয়ে ওধারে দেখা যায় মোকাট্টার হিল। পিরামিড তৈরির জন্যে ঐ পাহাড় থেকে দু'টন ওজনের পাথরের ব্লকগুলো আনা হয়েছে।

যাঁরা পিরামিডে উঠবেন তাঁদের জন্যে আমার পরামর্শ যে একই দিনে তাঁরা যেন ওপরে ওঠা এবং ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা না করেন। আজকাল ভেতরে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে তবে বাদুড়ের উৎপাত আছে। মহিলারা সাবধান। একবার তো এক মহিলার মাথার চুলে একটা বাদুড় আটকে গিয়েছিল। সে এক কাণ্ড। ভেতরে কিংস চেম্বার ওপরে কুইন'স চেম্বার ইত্যাদি দেখা বেশ কষ্টসাধ্য।

মিশর অভিযানে নেপোলিয়ন তখন এই পিরামিডের নিচে ম্যামেলুকদের পরাজিত করেছিলেন। দশ হাজার অশ্বারোহী ম্যামেলুক ফরাসি সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল কিন্তু তারা নেপোলিয়নের সৈনিকদের বন্দুক ও কামানের সামনে দাঁড়াতে পারে নি, একদিনে দু'হাজার ম্যামেলুক মারা গিয়েছিল আর নেপোলিয়নের মারা গিয়েছিল মাত্র চব্বিশ জন।

পিরামিডগুলি দেখে নেপোলিয়ন মন্তব্য করেছিলেন যে সমস্ত পিরামিড থেকে যদি সব পাথরগুলো খুলে নেওয়া যায় তাহলে সেই সব পাথর দিয়ে পুরো ফ্রান্সের চারদিকে তিন মিটার উঁচু আর এক মিটার পুরু একটা দেওয়াল দেওয়া যাবে।

নেপোলিয়ন শুনেছিলেন যে পিরামিডের ভেতরে কিং'স চেম্বারের কিছু গুপ্ত রহস্য আছে। সেটা কি একবার যাচাই করা দরকার। একদিন পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করবাব আগে তিনি সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বললেন, কিং'স চেম্বারে তিনি একা প্রবেশ করবেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত করবেন। তাঁর আগে গ্রীক বীর অ্যালেকজাণ্ডারও কিং'স চেম্বারে কিছু সময় একা কাটিয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন একাই রাজপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন কিন্তু ফিরে এলেন যেন অন্য এক নেপোলিয়ন, মুখ সাদা। কোনো কথা বললেন না, গম্ভীর। প্রকৃতিস্থ হতে কিছু সময় লাগলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ভেতরে কি দেখলেন। নেপোলিয়ন বললেন যা দেখেছি তা আমি বলতে চাই না। নেপোলিয়ন কি দেখেছিলেন তা জানা যায় নি। সেও এক রহস্য।

নেপোলিয়ন ভেতরে যাবেন এই খবর আগে জানতে পেরে তাঁর শত্রুপক্ষের কেউ তাঁর আগে ভেতরে প্রবেশ করে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে নেপোলিয়নকে কোনো বিশ্বাসযোগ্যভাবে ভয় দেখিয়েছিল?

পিরামিডের সঙ্গে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনাও জড়িত আছে। যেমন ১৯৫৪ সালের জুন মাসের একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। গিজে পিরামিডের কাছে সাকারাতে একটা স্টেপ পিরামিড আছে। উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে সেইটি একমাত্র পিরামিড যার মধ্যে দস্যু প্রবেশ করে নি, কিছু চুরিও যায় নি। ভেতরে বাইরে সবকিছু অটুট ছিল।

মূল প্রকোষ্ঠে সিন্দুকে স্বর্ণমুদ্রা ও রত্নালংকার পাওয়া গেল এবং ভারি পাথরের তৈরি একটি শবাধারও দেখা গেল। শবাধারের ঢাকা বেশ ভারি। ঢাকাটি মজবুত করে বন্ধ রাখা হয়েছে, কেউ খুলতে পারে নি। অনেক পরিশ্রম করে এবং কপিকল বসিয়ে ঢাকা তোলা হলো কিন্তু ভেতরে কোনো শব নেই, শব যে একদা ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।

মিশরে আসবার আগে আমি চিন্তা করতুম ফারাওদের মৃতদেহ মমি করে রাখবার উদ্দেশ্য কি? মমির সঙ্গে মূল্যবান উপকরণাদিও কেন রাখা হতো এবং এসবই দুর্ভেদ্য এক পিরামিডের মধ্যেই বা রাখবার কারণটা কি?

অথচ তাজমহলের মতো এগুলি স্মৃতিমন্দিরও নয়।

মিশরে এসে প্রাচীন পুঁথিপত্র পড়ে এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি যা বুঝেছি তাহলো এই যে ফারাওরা বিশ্বাস করতেন যে একদিন না একদিন তাঁরা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তখন এইসব উপকরণ তাঁদের কাজে লাগবে। পৃথিবীতে ফিরে আসবার সম্ভাবনা ততদিনই থাকবে যতদিন তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীতে অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত থাকবে। ইতিমধ্যে তাঁর আত্মা হয়তো বায়ুমণ্ডলে কোনো উচ্চস্তরে বিচরণ করছে অথবা নরকে নির্দিষ্ট কিছুকাল অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছে। জানি না আমার অনুমান সঠিক কি না।

অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী অনেক ভ্রমণকারী পিরামিড দর্শনে আসে। নানা মতে বিশ্বাসী পৃথিবীতে কিছু সাধক সম্প্রদায় আছে। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-আচরণ এরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সাধারণ ভাবে এদের আমরা গুপ্ত সমিতি বলে থাকি। 'গুপ্ত' শব্দটি ব্যবহার করলেও এদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়, এরা নিজেদের গুপ্ত রাখতে চায়, এই মাত্র। নাইটস টেম্পলার, নস্টিকস, চারকোল বার্ণার, ইত্যাদি হলো কয়েকটি গুপ্ত সমিতির নাম।

রসিক্রুসিয়ান এইরকম একটি গুপ্ত সমিতি। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না তবে মনে হয় ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রাঞ্জ এই গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জার্মান। তিনি ভৌতবিদ্যা, প্রাচ্যের ভোজবাজী, আরব দর্শনে আগ্রহী ছিলেন। এই রসিক্রুসিয়ানরা গিজে পিরামিড সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী। ওরা সমবেতভাবে গিজে পিরামিডের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে মনে কোনো প্রার্থনা করে হয়তো। তারপর ওরা কায়রো থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ফেউম নামে একটি ওয়েসিসে যায়। সেখানে একটি হ্রদ আছে। সেই হ্রদের ধারে ছোট ছোট লাল ফুল ফোটে। ঐ লাল ফুল নাকি আর কোথাও ফোটে না। ওরা ঐ লাল ফুল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হ্রদটির চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ফুল পেলে তারা

কি করে তা ওরা প্রকাশ করে না।

মেসন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কাছে চিয়পস পিরামিড পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। ওরা কায়রোতে এলে পুরানো বইয়ের দোকানে মিশরের প্রাচীন আচার-ব্যবহার ও ফারাওদের কাহিনী সংক্রান্ত বই খোঁজ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাবা গঠন কবেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি ঐ গুপ্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। মেসনদের দ্বারা গঠিত ইউরোপের একটি সংস্থা থেকে তদানীন্তন মার্কিন রাজনীতিকরা নাকি প্রচুর অর্থসাহায্য পেতো। মার্কিন সরকার তাদের সরকারী দলিলপত্রে, কিছু মুদ্রা ও নোটে যে সীল ব্যবহার করে সেই মূল সীলটির বিপরীতে পিরামিডের ছাপ আছে। এই মূল সীল মার্কিন সরকারী মহলে 'গ্রেট সীল' নামে পরিচিত।

এই গ্রেট সীল-এ পিরামিডের ছাপ থাকার কারণ কি? এর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মেসন সমিতিভুক্ত যাঁরা সরকার গঠন করেছিলেন তাঁরা কি পিরামিড নির্মাতাদের ব শোদ্ভূত?

আরও যাঁরা পিরামিড দর্শনে আসতেন, পিরামিড সম্বন্ধে প্রাচীন বই বা অন্য কোনো তথ্যের খোঁজ নিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু বাইবেল-গবেষক বা বিশেষ কোনো গির্জাভুক্ত খ্রীশ্চান। এঁদের ধারণা পিরামিড ও তার ভেতরে যে-সব করিডর, সুড়ঙ্গপথ, প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি আছে সেগুলি বিশেষ মাপ অনুসারে নির্মিত। সেইসব মাপ অতীত বা ভবিষ্যত ঘটনা উল্লেখ করে।

নানা উদ্দেশ্যে নানা ব্যক্তি আসে। কিছু চুরি করবার মতলবে এখনও চোর আসে। একবার এক চোর আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছিল। একজন ইজিপ্টোলজিস্ট কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চিয়পস পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। ভেতরে কিছু দূর যাবার পর তিনি ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক আওয়াজ পেলেন। ছেনির ওপর কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করছে। মনে হলো আওয়াজ খুব কাছেই কোথাও হচ্ছে। তিনি কাছাকাছি এলাকাটা খোঁজ করলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না অথচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

খুঁজতে খুঁজতে তিনি কিং'স চেম্বারে প্রবেশ করলেন। সেখানে চোর ধরা পড়লো। দেওয়াল থেকে হায়রোগ্লিফ লিপি-সংবলিত একটি প্রস্তরখণ্ড খোলবার চেষ্টা করছিল লোকটি। ধরা পড়ে গেল।
প্রথমে যেখানে ঠুক ঠুক আওয়াজ শোনা গিয়েছিল সে জায়গাটা অনেক দূরে, সেখানে কোনো আওয়াজ শোনবার কথা নয় কিন্তু পিরামিডের গঠন-কৌশল এমন যে সেখানেও আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কত রকম রহস্য যে পিরামিডের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে তার বুঝি শেষ নেই। পিরামিডগুলি সম্বন্ধে নানা ভাষায় হাজার বই লেখা হয়েছে, নানা রহস্যেরও সন্ধান দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন লেখক ভিন্ন মত পোষণ করেন, ফলে গবেষকদের বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নীল নদের ব-দ্বীপে হাইরোগ্লিফ লিপি-সংবলিত একটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, যা ঐ লিপি পাঠোদ্ধারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই লিপি নিয়ে আজও গবেষণা চলছে, জটিলতাও বাড়ছে, একই লিপির তিন রকম পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর ফলে সমস্যা বেড়েই যাচ্ছে।
প্রাচীন মিশরীয়রা একদা জীবজন্তুর পূজা করতো যথা—বেড়াল, ষাঁড় ইত্যাদি। তারপর এইসব জীবজন্তুর মুণ্ডের সঙ্গে মনুষ্যদেহ আরোপ করা হয়, হাত-পা মানুষের মতো কিন্তু মুখ কোনো পশুর মুখের মতো।
প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো পৃথিবী একটা বিরাট থালার মতো, দূরের পাহাড়গুলো থালার কানা, বিশাল সমুদ্রে এই থালা ভাসছে। এসব ধারণা ছিল পিরামিড নির্মাণেরও অনেক আগে। ক্রমশ এইসব ধ্যানধারণার পরিবর্তন হয়।
ক্রমশ কয়েকজন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে সম্ভবতঃ ফারাও আখনাটনের সময় থেকে। এইসব দেবদেবীর নাম অসিরিস, আইসিস এবং হোরাস। এরপর উদয় হলেন মহান সূর্য দেবতা 'রা' যাঁর প্রতীক হলো পিরামিড। তখন থেকেই পিরামিডের সৃষ্টি। তবে সব গবেষক এ বিষয়ে একমত নন।

উনবিংশ বংশের সময় রা যুক্ত হলেন অন্যতম মহান দেবতা আমন-এর সঙ্গে এবং এই নতুন দেবতা সর্বশক্তিমান আমন-রা নামে পরিচিত হলেন। তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এই দেবতা অপেক্ষা পুরোহিতদের সঙ্গে, তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের পুরোহিতদের ওপর, তাঁদের নির্দেশই তারা মানতো।

হঠাৎ কি করে দেবদেবীর আবির্ভাব হলো? সম্ভবতঃ কোনো ফারাও বা পুরোহিত বা অলৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর দেবত্ব আরোপ করা হতো। ঐ সকল মৃত ব্যক্তি তাদের কবরে রক্ষিত নৌকোয় চেপে পরলোকে যাত্রা করতো।

থর হায়ারডাল প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল যে প্রাচীন মিশরীয়দের মতো সে প্যাপিরাসের তৈরি নৌকোয় চেপে সমুদ্রযাত্রা করবে। কিন্তু সে নৌকো সমুদ্রে টেঁকে নি কারণ প্রাচীন মিশরীয়রা প্রধানত নদীতে প্যাপিরাসের নৌকো ব্যবহার করতো। তারা সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে কাঠের নৌকো ব্যবহার করতো। কবরখানায় যত নৌকো পাওয়া গেছে সবই কাঠের তৈরি। প্রাচীন ফিনিশিয় বা ভারতীয়রা কাঠের নৌকোতেই চেপে সাগর লঙ্ঘন করতো।

আমার বিশ্বাস এখনও সমস্ত পিরামিডের ভেতর সব প্রকোষ্ঠে মানুষ প্রবেশ করতে পারে নি অথবা বালির পাহাড়ের নিচে হয়ত আরও ছোট-খাটো পিরামিড চাপা পড়ে থাকতে পারে। সেই সব প্রকোষ্ঠ বা পিরা-মিড কি রহস্য বহন করছে কে জানে?

চন্দ্রালোকে আলোকিত পিরামিডের এক আশ্চর্য রূপ। মনে হবে রূপ-কথার রাজ্য। ওখানে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, তীব্র তার আকর্ষণ। অনেকে মুক্তাকাশের নিচে চাঁদের আলোয় সারা রাত্রি কাটিয়ে দেয় কিন্তু কাঁকড়া বিছের ভয় আছে এবং রাত্রে এত শিশির পড়ে যে দেহ ভিজিয়ে দেয়। তবুও সে সব অসুবিধা উপেক্ষা করে অনেকেই বালির ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে বসে গল্প করে রাত্রি কাটিয়ে দেয়। সাবধানীরা তাঁবুর আশ্রয় নেয়।

আজকাল তো 'সন এত লুমিয়ের' প্রয়োগে এবং সঙ্গীত ও ধারাবিবরণী সহযোগে সন্ধ্যার পর দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও আরবী ভাষায় ধারাবিবরণী দেওয়া হয়। এক এক ভাষার জন্যে দিন নির্দিষ্ট করা আছে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন মারফত তারিখ জানানো হয়।
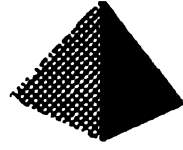
প্রহেলিকা ? কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা

৫

পূর্বের পরিচ্ছেদগুলি পড়ে অনুমান করা গেছে যে পিরামিড দেখতে যত সরল আসলে সে মোটেই সরল নয়। তাজমহল দেখে একজন ইংরেজ প্রবন্ধকার লিখেছেন 'সিম্পল ইয়েট ইন্ট্রিকেট', সরল কিন্তু জটিল। তাজমহল দেখতে বেশ সরল কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাজমহলের স্থাপত্য ও শিল্পকার্য বেশ জটিল। তবে তাজমহলকে ঘিরে কোনো রহস্য নেই কিন্তু পিরামিড ঘিরে অনেক রহস্য জমেছে যার কিছু সমাধান হয়েছে এবং অনেক সমাধান হতে এখনও বাকি আছে। নতুন নতুন রহস্যের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে।

যে মাপে পিরামিড তৈরি সেই মাপ অনুসরণ করে মডেল পিরামিড তৈরি করে নিচে মাংসখণ্ড রাখলে সে মাংসখণ্ড পচে না। দাড়ি কামাবার ব্লেড রাখলে তার ধার নষ্ট হয় না, মলিন রুপো রেখে দিলে তার চাকচিক্য আবার ফিরে আসে। এগুলি রহস্য। বিজ্ঞানীরা এখনও এগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পায় নি।

জেমস রেমণ্ড উলফ্ একজন গবেষক। পিরামিডে বা মডেল পিরামিডে যে অদৃশ্য শক্তি নিহিত আছে তিনি তার মূল রহস্য সমাধানের চেষ্টায় কিছু দিন ব্যাপৃত ছিলেন। আমেরিকার লয়ওলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর বিষয় ছিল প্যারানর্মাল ফেনোমেনা। মডেল পিরামিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও রেজার ব্লেডের ধার মডেল পিরামিডের নিচে কেন অক্ষুণ্ণ থাকে তা নিয়ে কোনো পরীক্ষা তিনি করেন

নি। এ ব্যাপারটা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। তবে তিনি মনে করেন যে তিনি যে-সব পরীক্ষা করেছেন তা যৎসামান্য, এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে আরও পরীক্ষা হওয়া দরকার। তিনি নিজে যে সব ফললাভ করেছেন সেগুলি নিয়ে আরও পরীক্ষা করা দরকার।

তাঁর পরীক্ষার বিষয় তাঁব নিজেব কথাতেই লিখছি।

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধবে আমি খাদ্যে বিষক্রিয়া জনিত বোটুলিজম প্রতিক্রিয়া আশংকা করছি। গতকাল দুপুবে আমি এক টুকবো বিফ খেয়েছি। ব্রিস্টল বোর্ড দিয়ে তৈরি একটি মডেল পিরামিডেব নিচে এবং সাধারণ তাপে ঐ মাংসখণ্ড দশ দিন বাখা ছিল। সেই মাংসখণ্ডটি আমি গতকাল খেয়েছি।

ঐ মাংসেব বং কালো হয়ে গিয়েছিল এবং সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল প্রায় বিসকুটের মতো, চাপ দিলে ভেঙে যাবে। রোদে শুকিয়ে নেওয়া শুঁটকি মাছেব মতোও বলা যায়। কোনো দুর্গন্ধও হয় নি, স্বাভাবিক গন্ধই ছিল।

একই সঙ্গে কার্ডবোর্ডের তৈরি একটি সাধাবণ বাক্সর নিচে একই মাপের এক টুকরো মাংস রাখা হয়েছিল কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় সেটি পচে এমন দুর্গন্ধ বেরোতে লাগলো যে সেটি ফেলে দিতে হলো।

বাসি বা পচা মাছ মাংসে বা অন্য খাদ্যে ব্যাসিলাস ক্লস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম নামে একরকম জীবাণু জন্মায়। সেই খাদ্য খেলে বোটুলিজম্ নামে তীব্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ফলে বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে যদি না যথোপযুক্ত চিকিৎসা কবা হয়।

শেষ পর্যন্ত আমার ভয় কেটে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম যে ঐ মারাত্মক জীবাণু একটু আগে যার নাম করলুম সে মডেল পিরামিডের নিচে রক্ষিত মাংসখণ্ডে মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং ঐ ভাবে মডেল পিরামিডের নিচে জান্তব প্রোটিন রাখলে কোনো জীবাণু তাকে নষ্ট করতে পারে না।

পিরামিডের একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক মাপের আকৃতি আছে এবং এমন একটা মাপের আধার সত্যই খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারে কি না সে পরীক্ষা আমি প্রায় আঠারো মাস ধরে সম্পন্ন করেছিলুম কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি। তবে আমি পরীক্ষা বন্ধ করি নি। বিভিন্ন বস্তু নিয়ে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা চালিয়েছি।

যে সকল ভ্রমণকারী চিয়পসের গ্রেট পিরামিড বা গিজে-এর পিরামিড দর্শন করেছেন তাঁরা কেউ কেউ বলেন যে পিরামিডের চূড়ো থেকে তাঁরা ফিকে নীল রশ্মি নির্গত হতে দেখেছেন। পিরামিডের চূড়োয় যাঁরা উঠেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন তাঁরা নাকি সহসা সারা দেহে পুলক অনুভব করেছেন, ওপরে ওঠার ক্লান্তি অবিলম্বে দূর হয়েছে। পিরামিডের ভেতরে কিছুক্ষণ থাকবার পর কারও নাকি মাথার জট ছেড়ে গিয়ে দুরূহ কোনো কাজ সম্পন্ন করার প্রেরণা দিয়েছে। সে ব্যক্তি হয়ত কোনো জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করতে পারছিলেন না কিন্তু পিরামিডের ভেতরে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার পর তাঁর মাথা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অচিরে সমাধান সূত্র আবিষ্কার করেন। কেউ কিছু জটিল বিষয় নিয়ে দুরূহ প্রবন্ধ সহজে এবং সরল ভাষায় লিখে ফেলেছেন।

জীবজন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারটা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন ফরাসি অ্যানটয়েন বভিস এই বইয়ের গোড়াতেই যাঁর নাম আছে। ১৯৩০ সাল নাগাদ তিনি গিজে পিরামিডের কিং'স চেম্বার দেখবার সময় লক্ষ্য করেন যে একটা ডাস্টবিনে মরা ইঁদুর ও বেড়াল পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হলো এই অবস্থায় তারা বেশ কয়েক দিন পড়ে আছে, পচে দুর্গন্ধ বেরোবার কথা কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে না। বভিস ভালো করে নজর করে দেখলেন যে সেগুলি একেবারে শুকিয়ে গেছে। জীবগুলি কোনোভাবে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, বেরোতে পারে নি, খাদ্যাভাবে বোধহয় মারা গেছে।

অ্যানটয়েন বভিস ভাবলেন এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার! এ রকম হলো কি করে?

ফ্রান্সে ফিরে গিজে পিরামিডের মাপ অনুসারে তিনি কার্ডবোর্ডের মডেল

এইভাবে আবার পিরামিড তৈরি করলুম। এইবার আর এক দফা পরীক্ষা করা যাক। নতুন পিরামিডে আমি পরীক্ষা আরম্ভ করলুম। সুপারমার্কেট থেকে সস্তা দামের হ্যামবারগার কিনে আনলুম। এই মাংস মিহি কুঁচি কুঁচি করে কাটা, শতকরা ২৫ ভাগ ফ্যাট থাকে, তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমার পরীক্ষার পক্ষে সুবিধে। তাড়াতাড়ি নষ্ট হতে থাকলে আমিও তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব কি হারে খারাপ হচ্ছে। প্ল্যাটফরম হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য ছুটি কাপ উলটো করে রেখেছিলুম, একটা কাপ ছিল ঠিক পিরামিডের নিচে আর অপরটা ছিল কার্ডবোর্ড বক্সের নিচে। দু'টি কাপের ওপরে এক চামচ করে হ্যামবারগার রাখলুম। একটি কাপ রইলো কার্ডবোর্ড বক্সের নিচে আব অপরটি রইলো পিরামিডের নিচে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হবাব আগেই দেখা গেল কার্ডবোর্ড বক্সের নিচের হ্যামবারগার নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু পিরামিডেব নিচের হ্যামবারগাবের রং কালো হতে আরম্ভ করেছে, জলও শুকিয়েছে এবং কোনোরকম পচনক্রিয়া আরম্ভ হয় নি। দশ দিন পরে ঐ হ্যামবারগার খটখটে হয়ে শুকিয়ে গেল এবং শুকিয়ে যাওয়ার দরুন পরিমাণ সংকুচিত হয়েছে। কোনো গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না, নির্গন্ধ। তবে এই হ্যামবাবগার আমি খাই নি।

আচ্ছা এবাব দেখা যাক ঐ হ্যামবারগারে জীবাণু জন্মানো যায় কি না। এইজন্যে পিরামিডের নিচে থেকে আমি ঐ হ্যামবারগার তুলে নিয়ে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিলুম, ফ্যাট অংশ বাদ দিলুম তারপর কিছু নির্গন্ধ জিলেটিন মিশিয়ে জীবাণু উৎপন্ন করবার কালচার মিডিয়া তৈরি করে পোরসিলেনের অগভীর বাটিতে রেখে বাটির কানায় ভেসলিন লাগিয়ে তার ওপর একটি কাঁচ ঢাকা দিলুম যাতে না হাওয়া ঢুকতে পারে। তার আগে কিছু হ্যামবারগার তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু কালচার মিডিয়ার ওপর ছড়িয়ে দিলুম। তারপর সেটিকে ঘরের সাধারণ তাপেই রেখে দিলুম। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই কালচার মিডিয়াতে এবং হ্যামবারগারে জীবাণুব কলোনি দেখা দিলো।

এরকম হওয়ার কথা নয়। তখন আমি অনুমান করলুম যে পোর্সিলেন-বাটিতে কাঁচ ঢাকা দেবার পূর্বে সবকিছুই তো বাতাসের সংস্পর্শে এসেছিল অতএব জীবাণু বাতাসে ভেসে এসেই বাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। অতএব আরও সাবধানতা দরকার।

এবার পরীক্ষাটি একটু অন্যভাবে করলুম। এবার আমি হ্যামবারগার বা কোনোরকম কালচার মিডিয়ার পরিবর্তে একই আকার এবং প্রায় একই ওজনের দু'টি পাকা টোম্যাটো বেছে নিলুম, কাপ দু'টিকে জীবাণু-মুক্ত করলুম, টোম্যাটো দু'টিকে উত্তমরূপে ধুয়ে নিলুম। তারপর দু'টি কাপের ওপর দু'টি টোম্যাটো রেখে একটি রাখলুম পিরামিডের নিচে অপরটি কার্ডবোর্ড বক্সের নিচে।

দশ দিনের মধ্যে পরের টোম্যাটোটি পচে গেছে এবং তার গায়ে ছাতা গজিয়েছে কিন্তু পিরামিডের নিচের টোম্যাটোটি কুঁচকে গেছে কিন্তু তার উজ্জ্বল বর্ণ একটুও ম্লান হয় নি। সেটিকে আমি কেটে দেখলুম কোথাও পচন আরম্ভ হয় নি।

এবার দেখা যাক গাছের বীজ অঙ্কুরোদ্গমে পিরামিড কতটা সাহায্য করতে পারে? কিন্তু বীজের ওপর পিরামিড ঢাকা দিলে তো রোদ বা আলো প্রবেশ করতে পারবে না, সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়াও বন্ধ হয়, বীজ থেকে চারা বেরোবে না। অতএব কি করা যায়?

একটা গবেষণা পত্র পড়ে দেখলুম যে জনৈক বিজ্ঞানী ছ-সপ্তাহ ধরে পিরামিডের ভেতরে অ্যালুমিনিয়ম পাত রেখে সেগুলি 'পিরামিড পাওয়ার' দ্বারা চার্জ করে নিয়েছিলেন। ভিজে মাটিতে যেখানে অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে বীজ ছড়ানো হয়েছিল সেখানে চার্জ করা ঐ অ্যালুমিনিয়ম পাত রেখে দেখা গেছে যে ফল ভালো হয়েছে। পাশে জমিতে যেখানে অ্যালু-মিনিয়ম পাত রাখা ছিল না তার অঙ্কুরোদ্গমের হার যথাযথ, বাড়তি ফল কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি অ্যালুমিনিয়ম ফয়েলের পরিবর্তে কার্বন রড 'পিরামিড পাওয়ার' দ্বারা চার্জ করে আশাতিরিক্ত ভালো ফল পেয়েছি। এই পরীক্ষায় সাফল্য-

লাভ করে কিছু জল মডেল পিরামিডের ভেতর কিছুদিন রেখে সেই জল বীজের ওপর ছিটিয়েও ভালো ফল পেয়েছি। সাধারণ জল অপেক্ষা অঙ্কুরোদগমের হার বেশি এবং চারা আরও সতেজ।

মডেল পিরামিড মাছ, মাংস বা টোম্যাটো থেকে জল সম্পূর্ণ শুষে নেয় দেখেছি। শুধু জল রাখলে তা কি উবে যাবে? দেখা যাক।

এক'শ মিলিলিটার মাপের দুটি শিশিতে জল নিলুম। একটি শিশি রাখলুম আমার মডেল পিরামিডের নিচে আর অপরটি সাধারণ কার্ডবোর্ড বাক্সটির নিচে। পরদিন সকালে দেখলুম পিরামিডের নিচের শিশিতে জল কমেছে সতেরো মিলিলিটার এবং কার্ডবোর্ড বাক্সের নিচের শিশিতে জল কমেছে বারো মিলিলিটার।

'পিরামিড পাওয়ার' চার্জ করা জলে বা পিরামিড ওয়াটারে গাছের বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়, চারা সতেজ হয়, তাহলে সেই জলের অন্য গুণও থাকতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা যাক। বসন্তের টিকে দেবার আগে টিকেদাতা যেমন রেকটিফায়েড স্পিরিট হাতে বেশ করে ঘসে দেন আমিও সেইরকম আইসো-বিউটাইল অ্যালকোহল আমার হাতে তুলো দিয়ে ঘসে দিলুম তারপর মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁক রেখে ব্লেডের কোণ দিয়ে লম্বা করে চিরে দিলুম। খুব হালকা রক্ত চেরা দাগ দুটি ভরে দিলো। পিরামিড জলে তুলো ভিজিয়ে একটি দাগ মুছে দিলুম আর অপর দাগটি মুছলুম ডিস্টিলড ওয়াটারে ভেজানো তুলো দিয়ে। তারপর পিরামিড জলে একটি সার্জিক্যাল গজ দিয়ে একটি কাটা দাগ ঢেকে দিলুম আর অপর দাগটি ঢেকে দিলুম ডিস্টিলড ওয়াটারে ভেজানো সার্জিক্যাল গজ দিয়ে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পিরামিড জলে ভেজানো প্রথম দাগটি প্রায় শুকিয়ে গেছে আর অপর দাগটির ওপর একটি কালো রেখা পড়েছে, সাধারণত যেমন দেখা যায়। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা অন্তে দেখা গেল যে প্রথম দাগটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় দাগটির ওপর থেকে কালো রেখা প্রায় উঠে গেছে কিন্তু ক্ষতের সরু দাগটি দেখা যাচ্ছে।

মডেল পিরামিড নিয়ে এবং চিয়পস পিরামিডেও আমি নানারকম পরীক্ষা করলুম, ফটোফিল্ম, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি নিয়ে, কখনও সফল হয়েছি, কখনও বিফল তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে মূল পিরামিড এবং মডেল পিরামিডের ভেতর ফাঁপা জায়গাটি কোনো-না-কোনো রকম শক্তির আধার তবে সে শক্তি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তি নয়। সেই শক্তি বিভিন্ন পদার্থের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক হেরোডোটাস আমাদের বলেছেন যে চিয়পসের গ্রেট পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল কুড়ি বছর। পিরামিডটি তৈরি করতে কুড়ি লক্ষ ষাট হাজার পাথরের ব্লক পাহাড় থেকে কেটে পরিষ্কার ও চতুষ্কোণ আকৃতি দিয়ে দীর্ঘ পথ বহন করে এনে বসাতে হয়েছিল। শুধু এইটুকুই নয়, এইসঙ্গে আরও অনেক কাজ করতে হয়। মূল পিরামিডে ঠিকমতো জায়গায় ভারি পাথর বসাতে বেশি সময় লাগে এবং তুটো চারটে পাথর নয়, বিশ লক্ষ ষাট হাজারটি।

কুড়ি বছরে যে সময় পাওয়া যায় সেই সময় হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতি পাথরের জন্যে চার মিনিট সময় লাগার কথা। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শ্রমিকরা কুড়ি বছর ধরে দিন রাত্রি কাজ করেছে যদিও তা করা হয় নি। কারণ আমরা শুনেছি যে নীল নদে বন্যার সময়ই শ্রমিক পাওয়া যেতো, অন্য সময় শ্রমিক পাওয়া গেলেও তাদের সংখ্যা কম।

মিশরের ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে ফারাও চিয়পস বা খুফু যিনি এই পিরামিড তৈরি করেছেন তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ২৮৭৭ পর্যন্ত এই তেইশ বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন। মৃত্যু না হলে আরও দীর্ঘ সময় হয়তো রাজ্য শাসন করতেন। তাহলে যদি ধরে নেওয়া যায় যে সিংহাসনে বসেই তিনি পিরামিড তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন তাহলে প্রতিটি পাথর সংগ্রহ থেকে পিরামিডে বসানো পর্যন্ত সময় লেগেছে প্রতিটি পাথরের জন্যে চার মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেণ্ড। অনেক বড় গুণভাগ করতে হবে যেমন

কুড়ি বছরে কত মিনিট তারপর সেই মিনিট দিয়ে কুড়ি লক্ষ পাথর ভাগ করে দেখতে হবে প্রতি পাথরের জন্যে চার মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেণ্ড ঠিক লাগছে কি না। কমপিউটারে অবশ্য হিসেবটা দ্রুত বেরিয়ে যাবে। এবং হিসেব করেই দেখা গেছে যে চিয়পসের শাসনকালে ঐ গ্রেট পিরামিড নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে পারে না। অবশ্য পিরামিডের ভেতরে এক জায়গায় তাঁর নাম পাওয়া গেছে। নাম থাকলেই যে নির্মাতা চিয়পস তাও যেমন বলা যায় না আবার সেই ব্যক্তিই যে ফারাও চিয়পস তাও সঠিকভাবে বলা যায় না।

একটা প্রাচীন প্যাপিরাস লিপি পাওয়া গেছে। চিয়পসের এক পুত্র হারদেফেফ লিখছে যে বেন-এর বেনবেন আমার পিতা উন্মোচন করেছিলেন। বেন মানে পাহাড়, বেনবেন মানে পাহাড় চূড়ো, এখানে অর্থ পিরামিড ও পিরামিডশীর্ষ। ইজিপ্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন লিখেছেন যে প্রাচীনকালে পিরামিডের পরিবর্তে বেন শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

মিশরের প্রাচীন পুঁথিপত্তর ঘেঁটে জানা যায় যে চিয়পস গিজে-এর আশপাশে অনেক মন্দির ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন কিন্তু তিনি যে পিরামিড তৈরি করেছিলেন এমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সেই যুগে পিরামিড বা স্ফিংক্স মূর্তি বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। চিয়পস হয়তো গ্রেট পিরামিডের মাথার বালি সরিয়ে বালি সরাবার কাজ উদ্বোধন করেছিলেন।

তাহলে চিয়পস পিরামিড কে তৈরি করলেন ?

ভিন্ন গ্রহ থেকে দেবতা এসে পিরামিড তৈরি করে দিয়ে গেছে ? এ কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। এই ধারণা আমি পুরোপুরি বাতিল করতে চাই।

যে সভ্যতাকে আমরা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা বলে জানি এবং যে সভ্যতা পৃথিবীর আদি সভ্যতা বলে দাবি করা হয় তারও পূর্বে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে যথা ককেসাস, আটলান্টিস, ইরান ও ভারত, প্রাচীন মিশর অপেক্ষা অনেক ধাপ এগিয়েছিল।

আমার বিশ্বাস খ্রীষ্টপূর্ব দশ হাজার বৎসরে আমাদের উপগ্রহ চাঁদ সৌর-জগতে কোনো আলোড়নের ফলে পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে, ফলে পৃথিবীর কোনো অংশে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যার ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন হয়। আটলান্টিস হয়তো এই সময়ে সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। এমন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী হ্যারল্ড উরে এ বিষয়ে গবেষণা করে অনেক তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। আরও কয়েকজন কৃতী বিজ্ঞানী যথা—ইগনেসিয়াস ডনেলি, ইম্যানুয়েল ভেলিকভস্কি এবং আবও কেউ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সমর্থন করেন।

পৃথিবীর কোনো জায়গায় পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এবং নতুন পাহাড় গজিয়ে উঠলেও, অথবা এখানকার জলরাশি ওখানে চলে গেলেও পৃথিবীর অনেক জায়গা অক্ষত থেকে গিয়েছিল যার মধ্যে নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চল ও উপত্যকা অন্যতম।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বে কয়েকটি সুসভ্য দেশ ছিল যার মধ্যে ককেসাস ও ভারত অন্যতম। তখনকার সভ্য মানুষেরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র যাত্রা শুরু করলো।

স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি এবং ডঃ মারগারেট মারে বিশ্বাস করেন যে ভারত থেকে রাজা নহুশ নীল নদের ব-দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং নহুশের নাম থেকেই নীল নদের নামকরণ করা হয়। মান্ধাতা তো দক্ষিণ আমেরিকায় সভ্যতা স্থাপন করেছিলেন এবং সে দেশের নাম দিয়েছিলেন রসাতল।

ভারতীয়রা যেমন মিশরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলো এবং নতুন দেশের নাম দিলো মিশ্র দেশ তেমনি ককেসাস থেকে মানুষ গিয়ে নীল উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। নীল উপত্যকায় এমন একটি দেবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে যা মিশরের কোনো দেবদেবীর সঙ্গে মেলে না অথচ সেরকম দেবমূর্তি ককেসাসে অনেক পাওয়া গেছে।

সভ্য দেশের মানুষ যখন অসভ্য দেশে হাজির হতো তখন অসভ্যরা এই

নতুন সভ্য মানুষদের দেবতা মনে করতো কারণ এই সব নতুন মানুষেরা সর্ব বিষয়ে তাদের চেয়ে উন্নত ছিল, বহু বিদ্যা জানতো। এই বিশ্বাস এখনও প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে কোনো নির্জন দ্বীপে কোনো বৈমানিককে হয়তো প্যারাশুটে করে নামতে হয়েছে অথবা প্রশান্ত মহাসাগরে রবারবোটে ভেসে কোনো সভ্য মানুষ কোনো দ্বীপে উঠে পড়েছে। স্থানীয় অনগ্রসর অধিবাসীরা এদের দেবতা মনে করে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছে।

ভারত থেকে আরও একটি দল ইজিপ্টে প্রবেশ করে সাবা বা সেবা নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এরা যুদ্ধ করে স্থানীয় অধিবাসীদের হটিয়ে দেয়। এদের সেনাপতির নাম ছিল নরমের বা মেনেস। উক্ত গবেষক দু'জন এই তথ্যে বিশ্বাস করেন। ইজিপ্টোলজি সম্বন্ধে সমস্ত বইতে একটি "নরমের'স স্লেটের" উল্লেখ আছে। সেই স্লেটে অর্থাৎ পাথরে নাকি নরমেরের কীর্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ককেসাস ও ভারত থেকে মানুষ মিশর দেশে গিয়ে সেখানে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে এবং এরাই পিরামিডগুলি তৈরি করেছিল। এই তথ্যের সমর্থনেও অনেক যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে।

অনেক দূরে সরে এসেছি। পিরামিড ও মডেল পিরামিডের ভেতরে একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, সেই অদৃশ্য শক্তি অসাধ্য সাধন করছে। এই শক্তি কোথা থেকে আসছে?

একটা শক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে সে শক্তি গ্রহ নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে সব কিছু টেনে রেখেছে। অণু পরমাণু তো পরস্পরকে আকর্ষণ করে রাখে তাদের ভেতরে অতি ক্ষুদ্র কণিকাও পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, সেখানেও আছে সূর্যের মতো কেন্দ্র যে কেন্দ্রকে ঘিরে ইলেকট্রন, প্রোটন ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না। সবাই সবাইকে আকর্ষণ করছে। ষোড়শ শতকে পারাসেলসাস ঘোষণা করলো আঠার মতো অদৃশ্য কিছু পৃথিবীর সব কিছুতে মাখানো আছে আর সেই আঠা সব কিছু আকর্ষণ

করে। চুম্বক কেনা জানে? লোহা দেখলেই চুম্বক তাকে কি করে টেনে নেয়। তারপর আছে মেসমেরিজম হিপনোটিজিম যার প্রভাব একজন মানুষ অপরজনের ওপর বিস্তার করতে পারে। এও একরকম শক্তি। এত-রকম অদৃশ্য শক্তি আসে কোথা থেকে? এর তো কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়না। এই সকল শক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এদের অস্তিত্ব আমরা টের পাই। মডেল পিরামিডের ভেতরেও শক্তির অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বিজ্ঞানের ছাত্ররা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির বিষয় জানেন। এই থিওরি বলে যে প্রত্যেক কণিকা নিজ নিজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। গিজে পিরামিডের অনুকরণে এবং ঐ মাপে যদি একটা পিরামিড তৈরি করা যায় তাহলে তার অক্ষ ঘিরে অদৃশ্য শক্তি উৎপাদিত হতে পারে এবং এই শক্তির প্রকাশও দেখা যেতে পারে, দেখা যাচ্ছেও।

গিজে পিরামিডে কিং'স চেম্বারের উচ্চতায় ঐ অদৃশ্য শক্তির বিকাশ দেখা যায়। এই অদৃশ্য শক্তিকে পিরামিড এনার্জি বা সংক্ষেপে 'পিই' বলা যেতে পারে। তবে সেই শক্তিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তিও বলতে পারি না।

চিয়পস পিরামিডে কিং'স চেম্বারটি মধ্যস্থলে এবং পিরামিড শীর্ষের ঠিক নিচে অবস্থিত। কিং'স চেম্বারে ওপরে পাথরগুলির আকার কনভেক্স লেনসের মতো এবং সেগুলি কোনো বিশেষ সূত্র ধরে বসানো হয়েছে। এই বিশেষ সূত্রই হয়তো মহাকাশ থেকে কোনো রশ্মি আকর্ষণ করে এনে শক্তিতে রূপান্তরিত করার সহায়ক। সে রশ্মি কসমিক বা মহাজাগতিক রশ্মিও হতে পারে, অন্য কোনো রশ্মিও হতে পারে।

পিরামিডকে শক্তি উৎপাদক বা পাওয়ার প্ল্যান্ট বললেও বোধহয় ভুল বলা হবে না। কিং'স চেম্বারে বিশেষ আকারের আধার রেখে আসা হতো। আধারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতো তারপর আধারগুলি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করা হতো, যথা খাদ্য সংরক্ষণ বা অন্য কোনো কাজে। এ যেন আধুনিক কালের ব্যাটারি চার্জ করার মতো।

পিরামিড শক্তি নিয়ে অনেক কাহিনী শোনা যায়, কিছু বা সত্য, কিছু বা অতিরঞ্জিত তবে সব কাহিনী মিথ্যা নয়। যেমন ১৮৩০ সালে জাহাজের একজন ক্যাপটেন, জি ভি ক্যাভিগলিয়া ; গ্রেট পিরামিডের ভেতরে কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন যেন অন্য মানুষ। প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দেন না। তিনি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা কাউকে বলেন নি।

অ্যালিস্টার ক্রাউলি এবং তার সদ্য বিবাহিত পত্নী রোজ কেলি পিরামিডের ভেতরে একটা রাত্রি কাটিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর রোজ কেলি অসাধারণ মানসিক শক্তি অর্জন করে যার ফল হলো 'বুক অফ দি ল' নামে বীভৎস একটি বই প্রকাশ। বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জন্যে বইখানি লেখা হয়েছিল যে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কম ব্যক্তিরই জানা আছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল ? ১৭৯৮ সালে মিশর অভিযানের সময় তিনি একা কিং'স চেম্বারে প্রবেশ করেছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে মনে হয়েছিল যে তিনি ভয় পেয়েছেন, রীতিমতো বিচলিত। নেপোলিয়নের মতো মানুষও ভয় পায়। কিন্তু তিনি কি দেখেছিলেন, শুনেছিলেন, বা সংকেত পেয়েছিলেন ? তিনি কি তাঁর নিষ্ঠুর ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলেন? নেপোলিয়ন কখনও কাউকে বলেন নি। তিনি যখন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন তখন ফরাসি ঐতিহাসিক কমটি ডি লা কেসেস নেপোলিয়নের স্মৃতিকথা লিখছিলেন। মিশর অভিযান প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন পিরামিডে একা প্রবেশ করার কথাও বলেছিলেন কিন্তু ভেতরে কি দেখেছিলেন বলতে গিয়েও বলেন নি। হঠাৎ থেমে গিয়ে হাত নেড়ে বলেছিলেন, "সে কথা বলে লাভ কি ? এখন বললেও তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না"। তাহলে তিনি কিছু দেখেছিলেন।

জেমস রেমণ্ড উলফ্-এর বিবৃতি শেষ হলো। এবার আমরা ম্যাক্স টথ-এর অভিজ্ঞতা শুনব। টথ আসলে প্যারাসাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করেন।

বর্তমানে প্যারাসাইকোলজিকে বলা হচ্ছে 'সাইকোট্রনিক'।

ম্যাক্স টথ-এর আগ্রহ নানা বিষয়ে, নানা বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছেন। নিউরোলজি, ইলেকট্রনিক, মানুষের অলৌকিক শক্তি এবং পিরামিড এনার্জি সম্বন্ধেও তিনি অনেক কাজ করেছেন, সাইকোট্রনিক তো আছেই। পিরামিড ব্লেড শার্পনার নামে খ্যাত সেই ক্যারেল ড্রবালের সঙ্গে দেখা করতে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়েছিলেন। যে মডেল পিরামিডের পেটেন্ট নিয়েছিলেন সেই পিরামিড তিনি টথকে দেখালেন।

ব্লেডের ধার অটুট রাখবার জন্যে মডেল পিরামিড যাতে টথ আমেরিকায় তৈরি করতে পারে সেজন্যে ড্রবাল টথ-এর সঙ্গে একটা চুক্তি করলো। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে 'টথ পিরামিড কোম্পানি' স্থাপন করলো ম্যাক্স টথ।

ড্রবালের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার উপলক্ষে টথ ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করলো এবং বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলো যে পিরামিড এনার্জি এবং অন্যান্য অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সেখানকার বিজ্ঞানীদের আগ্রহ প্রচুর, কাজও হয়েছে অনেক।

প্রাগ শহরে একটা বেশ বড়সড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হলো। সেই সম্মেলনে আমেরিকা ও রাশিয়া প্রমুখ বাইশটি দেশের বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিল আর এক'শ তিনটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল। আলোচনাও হয়েছিল নানা বিষয়ে। লক্ষ্য করার বিষয় যে পিরামিড এনার্জিকে সকলেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সম্মেলন সার্থক হয়েছিল। এই নতুন শক্তি যাতে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে সকলে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পিরামিড এনার্জি বাতিল করতে পারলেন না।

গ্রেগ নিলসেনের সহযোগিতায় ম্যাক্স টথ 'পিরামিড পাওয়ার' নামে তথ্যপূর্ণ একটি বই লিখেছেন। পিরামিডের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কি করে তৈরি হলো, পিরামিড সম্বন্ধে উপকথা ইত্যাদি তথ্য তো আছেই কিন্তু সিংহভাগ দখল করেছে পিরামিড এনার্জি। কি করে মডেল তৈরি করতে হয়,

কি করে তা ব্যবহার করতে হয়, পরীক্ষা কি করে করতে হবে এবং কয়েকটি পরীক্ষার বিবরণও দেওয়া আছে। এক কথায় পিরামিড সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যপূর্ণ একটি প্রামাণ্য পুস্তক, ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে সোর্স বুক। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে এবং সেই বছরেই এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায়। বইখানি প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের ফ্রি ওয়ে প্রেস। বর্তমানে যাকে বলা হচ্ছে 'পিরামিডলজি' ম্যাক্স টথ তার সূত্রপাত করলেন।

কায়রো থেকে টরণ্টো

৬
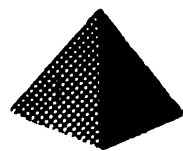
ক্যানাডার টরণ্টো শহরে নিউ হরাইজন রিসার্চ ফাউণ্ডেশন নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র আছে। মিসেস আইরিস ওয়েন এই গবেষণা কেন্দ্রের সেক্রেটারি। তাঁর স্বামী প্রফেসর এ আর জি ওয়েন একজন কৃতবিদ্য পুরুষ। টরণ্টো বিশ্বাবিদ্যালয়ে তিনি গণিতের অধ্যাপক কিন্তু আসলে তিনি প্যারাসাইকোলজিতে একজন বিশেষজ্ঞ। 'ক্যান উই এক্সপ্লেন দি পোলটারজিস্ট' নামে তিনি একখানি বই লিখে কয়েকটি পুরস্কার, খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন। মিসেস ওয়েন এবং তাঁর স্বামী টরণ্টোর ল্যাবরেটরিতে পিরামিড পাওয়ার নিয়ে অনেক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

মিসেস ওয়েন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকে কিছু উল্লেখ করছি। তিনি লিখছেন যে পিরামিড নিয়ে যত না রহস্য হয়েছে, প্রচার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। রাস্তায় একসঙ্গে সেই দু'শো কুকুর দেখার মতো গল্প আর কি? জেরা করতে করতে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে দু'শো নয়, মাত্র দু'টি কুকুর রাস্তায় দেখা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টের প্রফেসর আর ভি জোন্স "কর্নেল মাসেলহোয়াইট" ছদ্মনামে লণ্ডন টাইমস দৈনিকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে কম্পাসের কাঁটা অনুসারে উত্তর দক্ষিণ বরাবর দাড়ি কামাবার একখানি ব্লেড রেখে দিলে তার ধার বেড়ে যায়। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র ধার বাড়িয়ে দেয়। সত্যই কেউ এভাবে ব্লেড রেখে তার ধার পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কি

না আমাদের জানা নেই তবে পরে যখন শোনা গেল যে মডেল পিরামিডের নিচে ব্লেড রাখলে সে ব্লেড নাকি ভোঁতা হবে না তখন আমরা আগ্রহী হলুম। আমরা আরও শুনলুম যে শুধু দাড়ি কামাবার ব্লেড নয়, কাঁচা মাংস ও ফল রেখে দিলেও তাদের স্থায়িত্ব বাড়ে। অনেকে নাকি পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছেন। ১৯১১ সালে আমরাও নিউ হরাইজন রিসার্চ ফাউণ্ডেশনে পরীক্ষায় হাত দিলুম, এলোমেলো ভাবে নয়, কঠোরভাবে, প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে। আমাদের পরীক্ষায় কোথাও একটুও ফাঁকি ছিল না।

আগে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল আমরা সেগুলি উত্তমরূপে অনুধাবন করে কিছুতেই বুঝতে পারলুম না যে পিরামিড বা মডেল পিরামিডের ভেতরে কি অদৃশ্য শক্তি থাকতে পারে যা দাড়ি-কামাবার ব্লেডের ধার ফিরিয়ে আনে বা কোনো কোনো খাদ্য বস্তু দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করতে পারে।

অতএব আমরা নিজেরাই পরীক্ষা আরম্ভ করলুম। আমরা দু'টো পিরামিড নিলুম। বাজারে যে মডেল পিরামিড বিক্রি হচ্ছিল তাই একটা কিনলুম, চিয়পস পিরামিডের মাপ অনুসারে অমরা নিজেরা একটা পিরামিড তৈরি করলুম এবং বিভিন্ন আকারের কয়েকটা আধার বেছে নিলুম।

পিরামিড দু'টিকে আমরা পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ চুম্বক রেখার সমান্তরাল করে বসালুম। আধারগুলি সাধারণ ভাবেই রাখলুম। তারপর আমরা দু'টি পিরামিড ও আধারের নিচে একটি করে একই মাপ ও ওজনের এক টুকরো করে হ্যামবারগার, স্টেক বা মাংসের ফালি এবং কয়েকটা ফলের টুকরো রাখলুম।

নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর আমরা তিন রকম নমুনা পরীক্ষা করে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখতে পেলুম না।

কারণটা হলো হ্যামবারগারে কিছু প্রিজারভেটিভ অর্থাৎ এমন কোনো পদার্থ দেওয়া থাকে যার জন্যে জিনিসটি সহজে নষ্ট হয় না। ভালো কোয়া-

লিটির স্টেক তো এমনিই কয়েকদিন বেশ ভালইথাকে। আর কাঁচা ফল বাইরের বাতাস থেকে বাঁচিয়ে রাখলে কয়েকটা দিন অবিকৃত থাকে।
একজন বললো মূল যে শক্তি আছে চিয়পস পিরামিডে তা বাড়িতে তৈরি পিরামিডে আনা সম্ভব নয়। এই তথ্য আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। চিয়পস পিরামিড যেখানে অবস্থিত সেখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক, বাতাসে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প একেবারেই নেই, মানুষের শরীরে ঘাম দেয় না। সম্পূর্ণ শুষ্ক এই আবহাওয়া পচন নিবারণ করে। মিশরে অনেক মমি পাওয়া গেছে যেগুলি পিরামিডের বাইরে ছিল এবং একটিও নষ্ট হয় নি, অবিকৃত ছিল।
পেরুর মরু অঞ্চলে ইনকাদের কিছু মমি পাওয়া গিয়েছিল। মমিগুলি বালিতে প্রোথিত ছিল। আঞ্চলিক শুষ্ক মরু-সুলভ আবহাওয়ার জন্যে মৃতদেহগুলি নষ্ট হয় নি এবং আবৃত বস্ত্রগুলিও নষ্ট হয় নি। মমি রক্ষা করবার জন্যে যে সব রাসায়নিক প্রলেপ প্রাচীনেরা ব্যবহার করতো সেই প্রলেপ না লাগালেও মিশরে বা পেরুতে মমিগুলি অবিকৃত থাকতো।
এই ছ'য়ের (বা ষাটের) দশকের কথা বলছি। ইংলণ্ডে একজন হত্যাকারী ধরা পড়ে। সে উত্তর ওয়েলসে সমুদ্র তীরে এক শহরে যে বোর্ডিংহাউসে থাকতো সেই বোর্ডিং হাউসের বৃদ্ধা মালিককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার মৃতদেহ নিচতলায় একটা ছোট কুঠুরির (ক্লোজেট) মধ্যে টাঙিয়ে রেখে কুঠুরি বন্ধ করে চলে যায়। যাবার আগে বলে যায় যে কুঠুরির মধ্যে সে নিজের কিছু মালপত্র রেখে যাচ্ছে। কুঠুরি যেন খোলা না হয়। কয়েক বছর পরে নতুন ভাড়াটেরা কুঠুরি খুলে বৃদ্ধার লাস আবিষ্কার করে। দেহ পচে নি, পচা গন্ধও বেরোয় নি। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বললেন কুঠুরির ভেতর শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়া বৃদ্ধার মৃতদেহ মমি করে দিয়েছে। আদালতে যখন এই মামলা উঠলো তখন এটি "মমি মার্ডার ট্রায়াল" নামে সংবাদপত্রে খ্যাতি লাভ করেছিল।
দাড়ি কামবার ব্লেড নিয়েও আমরা কঠোরভাবে পরীক্ষা করেছিলুম কিন্তু কোনো তফাৎ টের পাই নি। সাধারণভাবেও দেখা যায় যে কয়েকবার

দাড়ি কামাবার পর একটি ব্লেড রেখে দিয়ে কয়েকদিন পরে আবার কামালে দেখা যায় যে তার ধার কিছু ফিরে এসেছে। এ তো নিজের বাড়িতে যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

দেশে দেশে পিরামিড

৭

এশিয়াবাসীরা বিশেষ করে ভারতীয়েরা হিমালয়কে নানা রহস্যের আলয় মনে করে। 'মনে-করে' বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বিশ্বাস করে। বিশাল হিমালয়ের কোনো কোণে যদি সাদা পাথরে নির্মিত ও স্বর্ণচূড়া শোভিত একটা প্রাচীন পিরামিড হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

তিব্বতে বিশাল পোটালা প্রাসাদ বা অন্যত্র বিরাট বৌদ্ধ মঠ যদি নির্মিত হতে পারে তাহলে একটা পিরামিড নির্মিত হওয়া কি অসম্ভব?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত থেকে চীনে সরবরাহ পাঠাবার জন্যে মার্কিন বিমান হিমালয়ের উত্তর পূর্ব অঞ্চল অতিক্রম করে চীনে পৌঁছতো। এই বিমানপথের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হাম্প'।

এই হাম্প পথে ওড়বার সময় মার্কিন পাইলটরা অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে দু'টি জিনিস দেখে বিস্মিত হয়েছিল। একটি হলো নতুন একটি উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ, যার নাম আমনি মাচেন। আমেরিকান পাইলটদের মতে এই পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট অপেক্ষা উঁচু। এই শৃঙ্গের উচ্চতা অন্ততঃ তিরিশ হাজার ফুট। অপরটি হলো সমতল একটি উপত্যকায় বিরাট এক পিরামিড, যার গায়ে রোদ পড়লে ঝলমল করে, যার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত না হলেও সুবর্ণের মতোই উজ্জ্বল।

পাইলটরা তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত এবং যুদ্ধের জন্যই তখন অনেক খবর প্রচার করা হতো না। পাইলটরা সেই পিরামিডের কোনো ফটোগ্রাফ তুলেছিল কি না অথবা পিরামিডের যথাযথ স্থান নির্ণয় করেছিল কি না

এ নিয়ে কোনো সংবাদ প্রচারিত হয় নি।

যুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব চীনে একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী আম্‌নি মাচেন পাহাড়ে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দুর্গম পথ, ঘন ঘন তুষার ঝঞ্ঝা এবং একদল হিংস্র প্রকৃতির আদিবাসীর প্রবল বাধা অতিক্রম করে ঐ অভিযাত্রী বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

এরপর তো চীনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো এবং ইতিহাসটাই একেবারে পালটে গেল ; সুবর্ণচূড়া সাদা পিরামিডের কেউ সন্ধান করেছিল কি না জানা যায় নি।

'হাম্প' নামে এই বিমানপথটি খুবই বিপজ্জনক ছিল। এর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র পাঁচশত মাইল কিন্তু আবহাওয়া প্রায়ই খারাপ থাকতো। মেঘ বা কুয়াশায় আকাশ আবৃত থাকতো, বেশি দূর দৃষ্টি চলতো না। অনেক উচ্চ পাহাড় ছিল, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে খুব উঁচু দিয়ে উড়তে হতো, বিমানের ডানায় তুষার জমে যেতো। পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অনেক বিমান ধ্বংস হয়েছে।

তবু মাঝে মাঝে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকতো, রোদ উঠতো, সেই সময়ে দেখা যেতো আম্‌নি মাচেন-এর শুভ্র শৃঙ্গ, সাদা পিরামিড, প্রাচীন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ এবং ভেঙে পড়ে থাকা অনেক বিমান।

জেমস গসম্যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একজন পাইলট। বর্তমানে সে আমেরিকার লুইজিয়ানা স্টেটে নিউ অরলিনস শহরে বাস করছে। সে যুদ্ধের সময়ে আসাম টু চায়না হাম্প পথে কার্গো প্লেন চালাতো। ক্রেট ভর্তি রাইফেল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড পৌঁছে দিত চীনা সামরিক বিভাগে। এই গসম্যান ঐ সাদা পিরামিড দেখেছে।

গসম্যান বেশ জোর দিয়েই বলেছে "আই নো দি লেজেণ্ড অ্যাবাউট দি হোয়াইট পিরামিড ইজ ট্রু। আই হ্যাভ সিন ইট উইথ মাই ওন আইজ"।

১৯৪২ সালের কোনো এক দিন গসম্যান বিমানভর্তি মাল নিয়ে যখন চীন যাচ্ছিলো তখন মাঝপথে অর্থাৎ আকাশে তার বিমানে গোলমাল

দেখা দিলো। এদিন কিন্তু আবহাওয়া ভালো ছিল, আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। কিন্তু তাতে কি হলো? বিমান নামাবার তো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে এঞ্জিন বন্ধ হলো বলে।

সঙ্গে আরও বিমান ছিল কিন্তু উচ্চাকাশে তারা কি করে গসম্যানকে সাহায্য করবে? তাছাড়া তখন নির্দেশ ছিল যে কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা করবে না। অপর বিমানগুলি চলে গেল।

গসম্যান অনেক চেষ্টা করেও বিমান ঠিক করতে না পেরে পুরনো একটা কৌশল চেষ্টা করলো। সে তার বিমানখানা হঠাৎ ডাইভ খাওয়ালো। কয়েক হাজার ফুট পড়তে না পড়তে এঞ্জিন যথারীতি চালু হয়ে গেল।

গসম্যান বিমানখানা সোজা করে স্থির করলো সে আসামের বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে যাবে। সামনে একটা বেশ বড় ও উঁচু পাহাড়। পাহাড়টা এড়াবার জন্যে গসম্যান একটা অন্য পথ ধরলো।

মিনিট কয়েক পরেই সে কি দেখল? নিচে সমতল এক উপত্যকা আর সেই উপত্যকার মাঝখানে শোভা পাচ্ছে বিরাট একটা সাদা পিরামিড, রোদ পড়ে ঝলমল করছে আর মাথাটা যেন সোনার পাত দিয়ে মোড়া, চকচক করছে। গসম্যান যতটা পারলো বিমান নামিয়ে পিরামিডটা ভালো করে দেখলো। তারপর ওখান থেকে উড়ে এসে ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে আসামে তার ঘাঁটিতে ফিরে এলো।

বিমানঘাঁটিতে একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার ছিল। গসম্যান তার কাছে হোয়াইট পিরামিড সম্বন্ধে রিপোর্ট করলো। অফিসার বলেছিল যে ব্যাপারটা সে যথাস্থানে জানিয়ে দেবে কিন্তু সে কিছুই করে নি কিংবা যুদ্ধের চাপে করতে পারে নি।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে গসম্যান আসাম ফ্রন্ট থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। যুদ্ধের পর গসম্যানের ইচ্ছে হয়েছিল যে সে একবার হোয়াইট পিরামিড দেখতে যাবে এবং সম্ভব হলে ছবি তুলে আনবে কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়, গসম্যানের ইচ্ছা পূরণ হয় নি। তবে সে আশা করে একদিন না একদিন হোয়াইট পিরামিড আবিষ্কৃত হবেই। গসম্যান

তার সরকারকে অথবা চীন সরকারকে এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছে কি না তা অজ্ঞাত।

গসম্যানের কথা কেউ কেউ অবিশ্বাস করেছে। তারা বলেছে ওপর থেকে দেখা ত্রিকোণ পাহাড়কে পিরামিড বলে ভুল হতে পারে। উত্তরে গসম্যান বলেছে পাইলটরা অত ভুল দেখলে তাদের চাকরি থাকে না, দৃষ্টিশক্তি ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বিচার করে তাদের নিয়োগ করা হয়। সে যা দেখেছে ঠিকই দেখেছে। ভুল দেখে নি।

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ কেন পিরামিড তৈরি করলো? এগুলি তাদের কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করতো? আর কি ভাবেই বা তারা এগুলি তৈরি করলো। প্রাচীন মানবের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই পিরামিড।

অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে যাঁরা পঠনপাঠন করেন বা অতীন্দ্রিয়বাদ বা অধ্যাত্মবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন পিরামিড হলো অতীত বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য আধার। থিওজফি বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি সিক্রেট ডক্ট্রিন'-এর লেখিকা স্বনামধন্য মাদাম ব্লাভাটস্কি বিশ্বাস করেন যে গণিতের মূল নীতি, বিজ্ঞানের সূত্র এবং অতীন্দ্রিয়বাদের কালজয়ী আধার এই পিরামিড।

ইউরোপিয়ান অকাল্ট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন ডঃ গান্থার রোজেনবার্গ বলেন ঠিক মতো অনুসন্ধান করলে পিরামিডের মাপজোপের মধ্যে বাইবেলের অনেক ঘটনার হদিশ পাওয়া যায়। বাইবেল লেখা হওয়ার আগেই পিরামিড তৈরি হয়েছে। পিরামিডের বিশেষ বিশেষ স্থানের মাপ বলে দেয় কবে সেই মহামানব যীশু জন্মগ্রহণ করবেন, কবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন ইত্যাদি।

আরবের ঐতিহাসিক আবু বালখির লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। সেই পাণ্ডুলিপি পড়ে জানা যায় যে সীমাহীন এক মহাপ্লাবনে পৃথিবী ডুবে যাবে অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা পিরামিডকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ঐ পুঁথিতে পিরামিডের বর্ণনাও দেওয়া আছে।

চীন দেশের ভেতরে আরও একটি বৃহৎ পিরামিড আছে। ১৯১৪ সালে আমে-

রিকান পাইলটরা তার একটি ফটোগ্রাফও তুলেছিল। পেন্টাগনে সামরিক বিভাগে পুরনো ফাইল-পত্তর ঘাঁটলে ফটোখানা বেরিয়ে যেতে পারে।

চীনের প্রাচীন রাজধানী প্রাচীর-ঘেরা শিয়ান-ফু শহর থেকে পশ্চিম দিকে কয়েক দিন হেঁটে গেলে এই পিরামিডটি দেখা যাবে। শিয়ান-ফু শহরটি পেকিং অপেক্ষা প্রাচীন এবং কোনসি প্রদেশে অবস্থিত।

১৯১২ সালের কথা। ফ্রেড মায়ার শ্রুডার এবং অসকার মামান তৎকালীন চৈনিক সামরিক বিভাগে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতো।

শ্রুডার লিখেছে যে শিয়ান-ফু শহরে আমরা একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের কাছে ঐ পিরামিডের কথা শুনি। পুরোহিত বলেছিলেন পশ্চিম দিক বরাবর গেলে ঐ পিরামিড নিশ্চয় চোখে পড়বে। আমি আর মামান দু'জনে ঘোড়ায় চেপে পুরানো রাস্তা অর্থাৎ যে রাস্তার আরম্ভ ইউরোপে এবং চীনের বুকের ওপর দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে কোরিয়া পর্যন্ত এবং যে রাস্তা দিয়ে মার্কো পোলো একদা চীন ভ্রমণে এসেছিলেন সেই পথ ধরে আমরা পশ্চিম দিকে চললুম। পথ চলতে চলতে আমরা মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের কাছে পিরামিড সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলুম।

একটা গ্রামে পৌঁছবার পর গ্রামবাসীরা বললো আমরা ঠিক পথেই এসেছি তবে এবার উত্তরে যেতে হবে, আর এক দিনের পথ বাকি।

গ্রামবাসীরা ঠিকই বলেছিল। পরদিন ভোরে যাত্রা করে সারাদিন চলে বিকেল নাগাদ আমরা পিরামিডটি দেখতে পেলুম। পিরামিড দেখে আমরা অবাক, অন্ততঃ হাজার ফুট উঁচু হবে, তার তলদেশ দেড়হাজার ফুট দীর্ঘ, মিশরে চিয়পসের গ্রেড পিরামিড অপেক্ষা নিশ্চয় সব দিক দিয়ে বড়। প্রাচীন পুঁথি বলে পিরামিডের বয়স অন্ততঃ ছ'হাজার বছর।

শ্রুডার ও মামানের পর আরও একজন বিদেশী ১৯৩০ সালে ঐ পিরামিডটি দেখেছিল, তার নাম ফ্রাংক স্টিফেনস। স্টিফেনস লিখেছে যে পিরামিডটি হাজার ফুট উঁচু তো হবেই, আমার হিসেব মতো বারো'শ ফুট এবং মানুষের তৈরি বৃহত্তম স্ট্রাকচার। তবে স্টিফেন চীনের প্রাচীরের উল্লেখ করে নি। সেইটি বোধহয় মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ স্ট্রাকচার।

এই পিরামিডটির চার দিকের রং চার রকম। পুব দিক সবুজ, দক্ষিণ দিক লাল, পশ্চিম দিক কালো এবং উত্তর দিক সাদা। চূড়োটি কিন্তু ছুঁচলো নয়, চাপা এবং সেখানে হলদে রং দেখা যায়। পৃথিবীর যাবতীয় পিরামিডের মতো শিয়ান-ফু পিরামিডেরও তল দেশের অক্ষরেখা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ চুম্বক রেখার সমান্তরাল।

শেনসি প্রদেশে স্টিফেন আরও সাতটি পিরামিড দেখেছিল তবে সব-গুলিরই মাথা চ্যাপ্টা। শিয়ান-ফু পিরামিড থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে আরও একটি পিবামিড আছে যার উচ্চতা পাঁচশ' ফুট। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে স্টিফেন পিরামিড সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। তারা কিছু বলতে পারে নি, তাদের বাপ ঠাকুর্দা পিরামিডগুলি ঐ একই ভাবে দেখে আসছে।

যে ফটোগ্রাফের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ১৯৪৭ সালেই আমেরিকার কোনো কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বর্তমান চীন সবকার এই পিরামিড সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি না জানা যায় নি তবে শোনা গিয়েছিল তারা নাকি চীনের প্রাচীর ভেঙে ফেলবে।

শেনসি পিবামিড যারা তৈরি করেছিল তারাই বোধহয় কালক্রমে মধ্য এশিয়ায় বামিয়ানে বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেছিল। প্রাকৃতিক ঝড় ঝঞ্ঝা খরা তুষারপাত উপেক্ষা করে এই মূর্তিগুলি কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের জগত বিরাট এইসব বুদ্ধমূর্তির কোনো খবর জানে না।

মাদাম ব্লাভাটাস্কি তাঁর সিক্রেট ডকুমেণ্ট বইতে লিখেছেন :

মধ্য এশিয়াতে হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশাল পারোপানিয়ান পর্বতের কোহ্-ই-বাবা শৃঙ্গের পদতলে এবং কাবুল থেকে বল্‌খ্ শহর পর্যন্ত সড়কের মাঝামাঝি এই বামিয়ান শহরের অবস্থিতি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত।

নামেই শহর। ভাঙাচোরা হতকুচ্ছিৎ। শহরের কোনো স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে নেই, রাস্তার অবস্থাও চরম। তবুও শহর, বনগাঁয়ে শেয়ালরাজা আর কি।

প্রাচীনকালে জুলজুল নামে একটি শহর ছিল, বামিয়ান ছিল সেই শহরের বাইরে পল্লীবিশেষ, যেমন কলকাতার ভবানীপুর বা ঢাকুরিয়া আর কি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্দান্ত চেঙ্গিস খাঁ শহরটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ছেড়েছিল, একটাও বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল না।

মাদাম আরও লিখছেন, সারা উপত্যকায় অনেক খাড়া খাড়া নীরেট ও বিরাটকায় পাথর দেখা যায় আর দেখা যায় অনেক গুহা। কিছু গুহা পাহাড় কেটে তৈরি আরও কিছু গুহা স্বাভাবিক। এইসব গুহায় বাস করতো বৌদ্ধ সাধুরা।

এক সার গুহার সামনে বুদ্ধের পাঁচটি বিরাট দণ্ডায়মান মূর্তি আজও দাঁড়িয়ে আছে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ এই পথে ভারতে আসবার সময় বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখেছিল।

সবচেয়ে বড় মূর্তিটির উচ্চতা ১৭৩ ফুট অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক বন্দরের সামনে রক্ষিত স্ট্যাচু অফ লিবার্টি অপেক্ষা ৭০ ফুট উঁচু।

এই মূর্তিগুলির সঙ্গে কর্ণাটকের শ্রবণবেলগোলায় একটি বিরাট পাথর কেটে মহাবীর মূর্তির তুলনা করা যেতে পারে। এই মূর্তিটি ১৭০ ফুট উঁচু।

এসব অবশ্য অতীত যুগের কথা। বর্তমান যুগে আমেরিকার সাউথ ডাকোটায় মাউন্ট রাশমোর পাহাড় কেটে কয়েকজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের যে সব মূল অবয়ব তৈরি করা হয়েছে সেগুলি চিবুক থেকে মাথা পর্যন্ত ষাট ফুট। আজকাল তো মানুষ নানারকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সুযোগ পায় কিন্তু সেকালে এতরকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। শুধু হয়তো হাতুড়ি ও বাটালি বা ছেনির সাহায্যে মানুষ এইসব বিরাট মূর্তি মন্দির বা পিরামিড তৈরি করেছিল। ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির যা নাকি রাষ্ট্রকূট স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন তা একটি পুরো পাহাড় কেটে তৈরি।

ডঃ গান্থার রোজেনবার্গ লিখেছেন যে যারা বামিয়ানে বুদ্ধ মূর্তিগুলি তৈরি করেছিল তারাই ভারতে গিয়ে অনেক পিরামিড (কৈলাসনাথের বা

রাজরাজেশ্বরের মতো মন্দির ?) নির্মাণ করেছে। তাঁর মতে হিন্দুদের পবিত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ পুরাণে এইসব পিরামিডের উল্লেখ আছে। প্রায় সব পিরামিডই ভেঙে পড়ে গেছে অথবা বিদেশী আক্রমণকারীরা সেগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে।

ভারতে পিরামিড ছিল কি না জানি না তবে মন্দির তো ছিলই বা আছে এবং অনেক মন্দির গজনীর মামুদ বা কালাপাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে। ইলিনয় স্টেটে কলিনসভিল। সেখানে আছে চাহোকিয়া মাউণ্ডস স্টেট পার্ক। এই স্টেট পার্কের মধ্যে দেখা যাবে মাটির তৈরি বিরাট এক পিরামিড। মোটরে গেলে সেন্ট লুই শহর থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ।

চাহোকিয়া পিরামিডের বেস্ চিয়পস পিরামিড অপেক্ষা মাপে বড়। এর বেস্ হাজার ফুট দীর্ঘ, আট'শ ফুট চওড়া। এর উচ্চতা অবশ্য মিশরের ঐ পিরামিড অপেক্ষা অনেক কম, মাত্র একশ' ফুট।

এই পিরামিড মাটির তৈরি। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে বলেছেন যে এই পিরামিড তৈরি করতে মাটি লেগেছে একুশ কোটি ঘন ফুট এবং ঐ পরিমাণ মাটি স্থানান্তরিত করতে সময় লেগেছে আড়াই'শ বছর।

আমেরিকায় এইটিই হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যা তৈরি হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের যন্ত্র এবং ঝুড়ির সাহায্যে। ঝুড়ি দিয়েই বোধহয় মাটি বহন করা হয়েছে। কে জানে সে যুগে হয়তো মানুষ ঝুড়ি ব্যবহার করত। টুকরিও হতে পারে।

কলিনসভিলের একজন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী বেশ মজার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আরে ওটা তো ওখানে অনেক দিন থেকেই আছে। আমরা তো ওর ওপর চড়ে খেলা করতুম। পণ্ডিতরা বলে না দিলে আমরা জানতেই পারতুম না ওটা অত পুরনো। গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে তো ঢাকা পড়েই গিয়েছিল।

সেন্ট লুইয়ের ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটির অ্যানথ্রোপলজিস্ট বা নৃতত্ত্ববিদ

ডঃ নেলসন রিড বলেন চাহোকিয়া হলো প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানদের লুপ্ত সভ্যতা। সমস্ত এলাকা জুড়ে রেড ইণ্ডিয়ানরা বাস করতো এখনও অনেক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নরবলি দেবার অগভীর গর্ত, সূর্যদেবতা, প্রাচীরও অন্যান্য পিরামিডের নমুনা দেখা যায়। ডঃ রিড ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন খনন কাজ চালিয়েছেন।

তাঁর মতে চাহোকিয়া এলাকায় অন্ততঃ আড়াই লক্ষ রেড ইণ্ডিয়ান বাস করতো। এদের রেড ইণ্ডিয়ান না বলে উডল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান বলাই ভালো কারণ এরা ঘন বনে বাস করতো। মনে হয় সাত'শ শতকেও এরা এখানে বাস করেছে। পরে জঙ্গল সাফ করে ভুট্টার চাষ আরম্ভ করেছে, কৃষি নির্ভর সমাজ গড়েছে। পরে অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যও করতো এবং এই সূত্রে বিস্তীর্ণ এলাকায় এরা ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলম্বাস ওদেশে পৌঁছবার আগেই ঐ প্রাচীন সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড খরা ও হাজার হাজার বন্য মহিষের আক্রমণে এই আদি-বাসীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ও তারা ক্রমশ দেশ ত্যাগ করতে থাকে।

১৭০০ শতকে ফরাসীরা চাহোকিয়া এলাকায় এসে পড়ে। তখনও কিছু আদিবাসী অবশিষ্ট ছিল। তারা বলেছিল "মহান প্রেত" তাদের বিলুপ্তির কারণ।

মার্কিন গবেষক-লেখক ওয়ারেন স্মিথ বলেন চাহোকিয়াতে মাটির ঐ বিশাল পিরামিড তৈরি করতে গিয়েই ওরা মরেছে। কম পরিশ্রমের ব্যাপার! মাটি বইতে বইতে জোয়ানরা অকালেই বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং বয়সে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগেই পরলোক প্রাপ্তি ঘটে যায়। ফলে পুরুষদের সংখ্যা কমতে থাকে। যার প্রত্যাক্ষ্য ফল জনসংখ্যা হ্রাস এবং জাতির অবলুপ্তি।

মাটি বওয়ার কাজ তো ছিলই তার ওপর শত্রুদের আক্রমণ ও বন্য জন্তুর আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে লড়াই করতে হ'তো। চাহোকিয়া রেড ইণ্ডিয়ানরা যে এইভাবে অবলুপ্ত হতে পারে তা বিশ্বাস করা যেতে পারে। অর্থাৎ পিরামিড নির্মাণই তাদের কাল হ'লো কিন্তু তারা কেন পিরামিড নির্মাণ করতো সে কারণটা অজ্ঞাত রয়ে গেল। সম্ভবত সে যুগে কোনো আচার

অনুষ্ঠান পালন করার উদ্দেশ্যে তারা পিরামিড নির্মাণ করতো।

ইলিনয় স্টেট ব্যতীত মনটানা স্টেটেও পিরামিডের নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে এগুলি হলো মিনি পিরামিড, মাত্র ফুট তিনেক উঁচু। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পিরামিডগুলি এলোমেলো ভাবে স্থাপন করা হয় নি। উত্তর পশ্চিম —দক্ষিণ পশ্চিম বরাবর একটা কাল্পনিক রেখা বরাবর এগুলি স্থাপন করা হয়েছিল।

এই মিনি পিরামিডগুলি কয়েক হাজার বছর পুরনো এবং কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। কি সে উদ্দেশ্য? তা পুরাতত্ত্ববিদরা বলতে পারবেন।

অ্যারিজোনা স্টেটের পুরাতত্ত্ববিদরা ১৯৫৯ সালে তাদেব রাজ্যে একটি ছোট পিরামিড আবিষ্কার করেছে। অনুমান করা হচ্ছে এই পিরামিডটি ৯০০ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে নির্মিত হয়েছে। এর গঠন চাহোকিয়া পিরামিডের অনুরূপ, মাথাটা ছুঁচলো নয়, ছাদের মতো সমতল, ফ্ল্যাট টপ।

মেকসিকোর পিরামিডগুলিও এই রকম। মেকসিকোর প্রাচীন মানুষদের মতো প্রাচীন অ্যারিজোনাবাসীরাও হয়তো এই পিরামিড মারফত কোনো পঞ্জিকা পদ্ধতি অনুসরণ করতো।

সুদূর আলাসকার নির্জন পাহাড়িয়া অঞ্চলেও দু'একটা পিরামিড দেখা গেছে। এখানে ওখানে হয়তো আরও পিরামিড অরণ্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাদের দেহে গাছপালা গজিয়ে অবস্থা এমন হয়েছে যে সেগুলি পিরামিড বলে বর্তমানে আর চেনাই যায় না।

মেকসিকোতে মেকসিকো সিটি থেকে অদূরে সূর্য ও চন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দু'টি পিরামিড আজও দেখা যায়। এ দু'টিও চূড়াবিহীন, মাথা সমতল ছাদের মতো।

মেকসিকোর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারলে আরও পিরামিড দেখা যেতে পারে। একজন যুবক ভ্রমণকারী এই উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিড এবং প্রাচীন মায়া সভ্যতার নিদর্শন

আবিষ্কার করেছে।
মেকসিকোতে প্রবেশ করার পর অভিযাত্রী কর্টেজ স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসকে লিখেছিলেন যে তিনি এই দেশের চোলুলা অঞ্চলে চারশ'টি পিরামিড দেখেছেন।
ডঃ গান্থার রোজেনবার্গ মিশর ও মেকসিকোর পিরামিডের মধ্যে গঠন-কাজেরও মাপজোপের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। মিশরের মতো মেকসিকোরও বৃহত্তম পিরামিড সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। নীল নদ উপত্যকায় যেমন একটি 'ভ্যালি অফ দি ডেড' আছে, মেকসিকোতেও তেমনি একটি 'স্ট্রীট অফ দি ডেড' আছে।
দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুতে আজও কয়েকটি ফ্ল্যাট টপ পিরামিড দেখা যায়। সেই পিরামিডগুলিতে ভ্রমণকারীদের উঠতেও দেওয়া হয়। বিশ্বাস করা হয় যে ব্রেজিলের দুর্ভেদ্য ঘন ম্যাটো গ্রসসো অরণ্যে বেশ কয়েকটি পিরামিড লুকিয়ে আছে যেগুলি ধনরত্নে পরিপূর্ণ।
১৯২৫ সালে কর্নেল পি এইচ ফসেট ম্যাটো গ্রসসো অরণ্যের রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে আর তিনি ফিরে আসেন নি। অভিযানের সময় তিনি মাঝে মাঝে রানার মারফত চিঠি পাঠাতেন। অরণ্যের আদিবাসীরা যারা ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত তারা ফসেটকে বলেছিল জঙ্গলের ভেতরে পাথরের একটা মিনার আছে, তার মাথায় একটা আলো জ্বলে, সে আলো কখনও নেবে না। কুসংস্কারবশত ইণ্ডিয়ানরা ঐ মিনারের কাছে যেতে রাজি হয় নি, ঐ মিনার অভিশপ্ত, ওর কাছে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।
ইংলণ্ডের উইল্টশায়ারে সিলবেলি হিল নামে ১৭০ ফুট উঁচু ভাঙাচোরা একটি ঢিবি বা টিলা দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন ওটি আসলে চার হাজার বছরের পুরনো মাটির তৈরি একটি পিরামিড।
হালে দক্ষিণ ফ্রান্সেও একটি পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। কারা নির্মাণ করেছিল সঠিক-ভাবে বলা যাচ্ছে না।

কারা বা কেন পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল সে বিষয়ে নানা মতামত শোনা যায়। কেউ বলে পিরামিড আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। যারা বিশ্বাস করে গ্রহান্তরের মানুষ এসে পিরামিড তৈরি করে গিয়েছিল তারাই নাকি পিরামিড মারফত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বা করতো। সেই গ্রহান্তরের মানুষের বিশেষ বার্তা, হয় পিরা-মিডের বিশেষ মাপজোপের মধ্যে অথবা কোনো অনাবিষ্কৃত কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে আজও লুকিয়ে আছে। উপযুক্ত সময়েই সেগুলি আবিষ্কৃত হবে এবং সেদিন জানা যাবে পিরামিড নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

কারও মতে মিরামিডগুলি এক একটি বিশাল গ্রন্থাগার। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে বিশ লক্ষ বছর কিন্তু অতীত সভ্যতার আমরা কতটুকু জানি। প্রাচীন সভ্য মানুষরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথা বাইবেলোক্ত বন্যা আশংকা করে অনেক বই পিরামিডের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সে বই নিশ্চয় আজকালকার ছাপা বইয়ের মতো নয়, হয়তো পাথরে খোদাই করা শিলালিপি অথবা তাম্রপত্রে খোদিত স্ক্রল, যেমন পাওয়া গিয়েছিল ডেড সি উপত্যকায় এক পাহাড়ের গুহায়।

আটলান্টিক মহাসাগরে আটলান্টিস নামে একটি দেশ ছিল। তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু দেশটি সঠিক কোথায় ছিল তা আজও রহস্যপূর্ণ। কোনো পিরামিডেই নাকি আটলান্টিস রহস্য নিহিত আছে।

কেউ বলেন, ওগুলির কোনো বিশেষত্ব নেই। সেকালে রাজারাজড়াদের মধ্যে স্থায়ী কোনো কীর্তি তৈরি করার দিকে প্রবণতা ছিল। এই পিরা-মিডগুলি তারই ফল। হয়তো পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও চলতো, কে কত বড় পিরামিড তৈরি করতে পারে ?

পিরামিডগুলি কোনো এক প্রকার অদৃশ্য শক্তির আধার। এ নিয়ে তো বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ বিষয়ে আলো-চনাও করা হয়েছে।

যে উদ্দেশ্যেই পিরামিড নির্মিত হয়ে থাকুক না কেন তা আজও রহস্য।
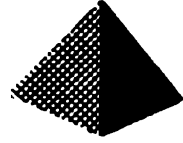
নতুনেরা কি বলেন ?

৮

ইংলণ্ডের উইল্টশায়ার কাউন্টিতে ডাউনটন শহরে যে প্যারাফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি আছে, মিঃ বেন-সন হারবার্ট হলেন সেই ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর। ইণ্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ প্যারাফিজিকস নামে একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও তিনি তাঁর পত্রিকার জন্মে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যানিষ্টিক সাইকোলজি-এর উদ্যোগে ১৯৭২ সালে ১৭ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত মসকোতে একটি মিটিং ডাকা হয়েছিল। মিঃ হারবার্ট সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সে সকল মানসিক শক্তি মস্তিষ্কে আঘাত প্রতিঘাত করে মিঃ হারবার্ট সেই বিষয়ে কিছু তথ্য পেশ করেন এবং এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে পিরামিড রহস্য নিয়েও আলোচনা হয়। মিঃ হারবার্ট তাঁর অভিজ্ঞতার যে বিবরণী তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন এখানে তার সারাংশ তাঁর নিজের কথাতেই তুলে দেওয়া হলো।

১৯১২ সালে মসকো কনফারেন্সে আমি যে সকল নবীন বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম তাদের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর নাম জারোস্লাভ ম্রকভিকা। ম্রকভিকার সঙ্গে ইতিপূর্বে ১৯১১ সালে এক সাইবারনেটিকস কনফারেন্সে চেকোস্লোভাকিয়াতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার ঐ কনফারেন্সে ম্রকভিকা প্যারাসাইকোলজির

ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রথম সারির প্যারাসাইকোলজিস্ট জেনেক রেডাক তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। মধ্য এশিয়াতে কাজাকাস্তান রিপাবলিকের রাজধানী আলমা আটা শহরে ব্রকভিকা কাজ করছিল। মসকো মিটিং-এ সে যোগ দিয়েছিল। আমার সঙ্গে আবার দেখা হলো।

চেকোস্লোভাকিয়ার এঞ্জিনিয়ার ক্যারেল ড্রবাল উক্ত ডঃ রেডাকের সঙ্গে পিরামিডের আকার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য নিয়ে একত্রে কাজ করেছে। ড্রবালের কাজে ব্রকভিকারও আগ্রহ আছে।

ড্রবালের কাজে যেমন ব্রকভিকা প্রমুখ বিজ্ঞানীর আগ্রহ বা সমর্থন আছে তেমনি অনেক বিজ্ঞানীও ড্রবালের আবিষ্কার বিশ্বাস করে না। এদের মধ্যে একজন হলেন জার্মানীর বিখ্যাত ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটের পারমাণবিক বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রেডবার্ট কার্গার।

ব্রকভিকা এবং কার্গারের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য শোনবার জন্যে আমি একদিন দু'জনকে মসকোর এক হোটেলে আমন্ত্রণ জানালুম। দু'জনেই আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন।

চেক পেটেন্ট অফিস ড্রবালের আবিষ্কার স্বীকার করে যে পাকা কাগজ দিয়েছিল তার একটি নকল ডঃ রেডাক আমাকে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি ছোট নমুনা পিরামিডও এনেছিলেন।

পিরামিডটি লাল রঙের প্লাস্টিকের তৈরি এবং একটি সাদা পাতের ওপর রক্ষিত। পিরামিডের চারদিকে চারটি সমবাহু ত্রিকোণ। প্রতি বাহুর মাপ ৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি কিন্তু যে সাদা চতুষ্কোণ পাতটির ওপর রাখা আছে তার প্রতিদিকের মাপ ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

পিরামিডের ভেতরে এক ইঞ্চি উঁচু একটি ছোট পেডেস্টাল আছে যার ওপর কামানোর পর রেজর ব্লেড রাখা হয়। বলা হয়েছে যে রেজর ব্লেডের লম্বা দিকের একটি মাথা উত্তর দিকে রাখতে হবে তাহলেই সেই ব্লেডের ধার দীর্ঘস্থায়ী হবে। ব্লেড ব্যতীত মাছ, চীজ ইত্যাদি দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা যাবে।

ড্রবালের এই পিরামিড এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে নিউ ইয়র্কে গঠিত টথ পিরামিড কোম্পানি কার্ডবোর্ডের পিরামিড তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে তবে এই পিরামিডগুলি আকারে কিছু বড়, ত্রিকোণের বাহুর মাপ ৬ ইঞ্চি।

ঐ কোম্পানির ডিরেক্টর ম্যাক্স টথ মসকোর ঐ মিটিং-এ হাজির ছিলেন। পিরামিডটি কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: যে কোনো ইলেকট্রিক চালিত যন্ত্র থেকে অন্ততঃ ছ' ফুট দূরে, জানালা এবং রেডিয়েটার থেকে তফাতে পিরামিডটি রাখতে হবে। কম্পাসের কাঁটা অনুসারে ব্লেডের লম্বা দিক উত্তরমুখী রাখতে হবে, এজন্যে ব্লেডের এক মাথায় 'উত্তর' বা ইংরেজি হরফ 'এন' চিহ্ন করে রাখা যেতে পারে। ব্যবহারের পূর্বে ব্লেডখানি অন্ততঃ সাত দিন এইভাবে রাখতে হবে। মাস-খানেক ব্যবহারের পর ব্লেডের ধার দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। ফুল, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি রক্ষা করতে হলে লম্বা দিক উত্তরমুখী করে রাখতে হবে এবং পিরামিডের নিচে যে পেডেস্টালের ওপর আহার্য দ্রব্য রাখা হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যে উক্ত বস্তুর সওয়া এক ইঞ্চির বেশি অংশ যেন পেডস্টালের বাইরে না থাকে। আহার্য বস্তু ক্রমশ নির্জলা হতে হতে ৬০ দিনের মধ্যে শুকিয়ে যাবে তবে ওজন বা সঞ্চিত জলের জন্যও সময়ের তারতম্য হতে পারে।

ডঃ রেডাক বলছেন যে ধারণাটা প্রথম আসে মঁসিয়ে বভিসের মাথায়। বডিস চিয়পস পিরামিডের ভেতরে ঢুকে কিছু ছোট মৃত প্রাণীর দেহ দেখতে পায়। অতবড় পিরামিডের ভেতরে মৃত ইঁদুর, ছুঁচো বা দু'চারটে কুকুর থাকতে পারে কিন্তু বভিস লক্ষ্য করলো যে মৃতদেহগুলি পচে যায় নি, শুকিয়ে গেছে মাত্র।

বিশেষ অবস্থায় ও বায়ুপ্রবাহের ফলে মৃতদেহ সহজে পচে না কিন্তু পিরা-মিডের ভেতরে সে পরিবেশ কোথায়? তখন ড্রবালের খেয়াল হলো যে পিরামিডের বিশেষ আকৃতিই মৃতদেহগুলি পচন থেকে রক্ষা করেছে।

রেডাক বলছেন ইউরোপে কোনো কোনো স্থানে পিরামিড নিয়ে পরীক্ষা

হয়তো সফল হতে পারে কিন্তু আমরা যে নিউ ফরেস্ট অঞ্চলে বাস করি সে জায়গাটা এত ড্যাম্প বা স্যাঁতসেঁতে যে আমাদের পরীক্ষা বিফল হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিডের আভ্যন্তরিক ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল।

বেনসন হারবার্ট লিখছেন যে এই সকল পিরামিড পরীক্ষার ওপর আমার নিজেরও বিশ্বাস ছিল না তবুও শোনা যাক এই দুই বিপরীতমুখী বিজ্ঞানী কি বলেন ? কার্গারের জেরার উত্তরে ব্রকভিকা কি বলে ?

আলোচনার সূত্রপাত করে ব্রকভিকাকে আমি বললুম যে পিরামিড পরীক্ষাগুলি আমার মনে এখনও বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে নি।

ব্রকভিকা বললো যে পিরামিড তৈরি করতে হলে সঠিক মাপ বা বিশেষ কোনো ধাতু, প্লাস্টিক বা পিচবোর্ড যে অবশ্যই প্রয়োজন তা নয় কারণ আমি দেখেছি যে পিরামিড তৈরির সময় হয়তো মাপের কিছু তারতম্য হয়েছে বা যে-কোনো পদার্থ দিয়ে আমি পিরামিড তৈরি করেছি কিন্তু সহজে নষ্ট হয়ে যায় এমন মাছ তার নিচে রেখে দেখেছি যে সে মাছ নষ্ট হয়ে তো যায়ই নি উপরন্তু সাত দিনের মধ্যে বিশুষ্ক হয়ে গেছে। অথচ একই সঙ্গে আমি মাত্র আধ মিটার দূরে ঐ একই জাতীয় আর একটি মাছ আমি কাচের পাত্রে রেখেছিলুম, সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপার-টাকে আমি আপাতত প্যারানরমাল বলতে পারি তবে ঠিক কিজন্যে এমন হচ্ছে তা জানবার জন্যে আমি গবেষণা করছি। একটা কোনো অদৃশ্য শক্তি পিরামিডের বিশেষ আকৃতির মধ্যে কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস।

কার্গার বললো, বিশ্বাস থাকা অবশ্যই ভালো নচেৎ কেউ সাফল্য লাভ করতে পারে না কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির কোনো সাড়া কি আপনি পেয়েছেন ? সেই অদৃশ্য শক্তি নিশ্চয়ই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ নয় ?

ব্রকভিকা বললো : সঠিক বলতে পারছি না, তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ হতেও পারে তবে তার প্রকৃতি ও তরঙ্গের মাপ নিশ্চয় ভিন্ন।

তাই যদি আপনার মনে হয় তাহলে তা কেবল পিরামিডের মধ্যে সক্রিয়

হবে কেন? যে-কোনো আকৃতির মধ্যে কার্যকরী হতে বাধা কোথায় ?
ব্রকভিকা উত্তর দিলেন, সেইটেই আমার সমস্যা, বৈজ্ঞানিক কোনো সূত্রের মধ্যে ব্যাপারটা আমি এখনও ফেলতে পারি নি। তবে আমি হতাশ হই নি। পিরামিডের ভেতরে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ থাকলেও তা থেকে যে সূক্ষ্মতম তাপ আশা করা যায় সে তাপেরও কোনো অস্তিত্ব আমি কোনো যন্ত্রে ধরতে পারি নি।
কার্গার বললেন, এজন্যে যে পিরামিডের বিশেষ আকৃতি দায়ী তা আমি মেনে নিতে পারছি না। পদার্থবিদ্যার যেটুকু আমরা জানি তা প্রয়োগ করে হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে না। হয়তো আগামী দিনে যা শিখবো তা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবো। যেমন তুমি বলছো ব্যাপারটা প্যারানরমাল বা 'সাইকোকাইনেসির'-মতো কিছু কিন্তু এই দু'টো ব্যাপারই তো আমরা নিজেরাই এখনও বুঝতে পারি না।
এই সময়ে আমি নিজেও কিছু মন্তব্য করলুম এবং পরীক্ষার ধারা কি রকম হওয়া উচিত সে বিষয়েও কিছু বললুম। পিরামিড আকৃতির কোনো বিশেষ ভূমিকা নিশ্চয় আছে সে আমরা বিশ্বাস করি আর না করি।
কাগার বললেন, পুরনো ব্লেড বেশ কয়েক দিন ফেলে রাখলে তা দিয়ে আবার কামানো যায়। ব্লেডের ধাতুতে কিছু পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটে এবং ঘটে যে তা ব্লেডখানি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে ধরা পড়ে। পড়ে থাকা পুরনো ব্লেডের গায়ে সূচের মতো কিছু জন্মায়। ব্লেড উত্তর দক্ষিণ-মুখী করে রাখলে ধার ফিরে আসে, আমার মনে হয় পুব-পশ্চিমমুখী করে রাখলেও একই ফল পাওয়া যাবে।
আমি বললুম, আমরা সাধারণত ব্লেড ক্ষুরের মধ্যেই রেখে দিই বা ব্যবহারের পর আবার ব্লেডের ক্ষুদ্র খামের মধ্যেই রেখে দিই কিন্তু মডেল পিরামিডের মধ্যে ব্লেড যেভাবে রাখা থাকে তার চারদিকে হাওয়া গেলে এবং ব্লেডের কামাবার দুই দিকে কোনো ধাতু স্পর্শ করে থাকে না। কিন্তু আমরা যেভাবে ব্লেড রাখি তাতে কি ধার ফিরে আসবে? পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কি সূক্ষ্ম সূচ জন্মাবে? এবং ধার কি ফিরে আসবে?

(কৌতূহলী পাঠকগণ কয়েকদিন পরে বাতিল ব্লেড দিয়ে কামিয়ে দেখতে পারেন যে সেই বাতিল ব্লেড দিয়ে আরও দু'চারবার কামানো যায় কি না। আমি স্বয়ং দেখেছি নতুনের মতো না হলেও আরও দু' একবার কামানো যায়।)

ব্রকভিকা বললো, আমি জ্রবালের আর একটা পরীক্ষার কথা বলবো। জ্রবাল একটা ঘরে দশ সেন্টিমিটার তফাতে সুতো দিয়ে দু'টুকরো মাংস আলাদা আলাদা ভাবে ঝুলিয়ে দিলো। ঘরের জানালা সব সময়েই খোলা থাকতো, ঘরে যেমন দিনের আলো প্রবেশ করতো তেমনি হাওয়াও সর্বদা প্রবেশ করতো। রাত্রিতেও জানালা বন্ধ করা হতো না।

কিন্তু এক টুকরো মাংসের ওপর সর্বদা একটা সবুজ আলো ফেলা হতো। দেখা গেল এই মাংসের টুকরোটি তাজা রয়েছে কিন্তু অপর মাংসের টুকরো যার ওপর সবুজ আলো ফেলা হয় নি সেই মাংসের টুকরো নষ্ট হয়ে গেছে।

বিয়ার মজুত রাখা নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়াতে কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। বিয়ার কেন গোলাকার পিপেতে রাখা হবে। চৌকো বা অন্য কোনো আকারের পাত্রে রাখলে ক্ষতি কি? অতএব বিভিন্ন ধরনের ও আকারের পাত্রে বিয়ার রেখে পরীক্ষা চালানো হলো এবং দেখা গেল যে চিরাচরিত গোলাকৃতি পিপেতে রক্ষিত বিয়ারের স্বাদ অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু অপর আকৃতির পাত্রে রক্ষিত বিয়ারের স্বাদ কটু হয়েছে, পানের অযোগ্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মজুত বস্তুর ওপর পাত্রের প্রভাব আছে। হয়তো দেখা যাবে যে পিরামিড আকারের পাত্রে বিয়ার রাখলে তা পরিপক্ক হবে না।

সেদিন মসকোর হোটেলে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। আরও গবেষণার প্রয়োজন। সব কিছুর সঠিক ব্যাখ্যা এখনও করা যাচ্ছে না। হয়তো নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তেমন কোনো সূত্র এই সব আপাতঃ অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি গ্রাহ্য করতে সাহায্য করবে অথবা বাতিল করবে। পিরামিড পাওয়ার থাকবে কি যাবে তখনই জানা যাবে।
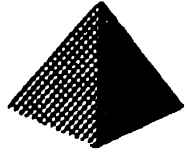
কত খরচ পড়বে ?

১ মানুষ এখন চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছে, মহাশূন্যে স্পেস শিপ পাঠাচ্ছে আর ইচ্ছে করলে কি চিয়পসের মতো একটা পিরামিড বানাতে পারবে না ? বিরাট বিরাট ব্রিজ আর আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তৈরি করছে আর একটা পিরামিড বানানো কি অসম্ভব ? না অসম্ভব নয়। মানুষ ইচ্ছে করলে একটা পিরামিড বানাতে পারে। এমন খেয়াল আমেরিকানদের মাথাতেই আসে এবং পিরামিড তৈরি করতে যে বিপুল অর্থ খরচ হবে সেই পরিমাণ অর্থ তাদের আছে।

আজ একটা পিরামিড বানাতে কত খরচ হবে ?

চিয়পস পিরামিড ৪৮০ ফুট উঁচু, নিচের বেস ৭৫০ ফুট চওড়া, একলক্ষ শ্রমিক নাকি তিরিশ বছর পরিশ্রম করে এই পিরামিডটি দাঁড় করিয়েছে। আজকাল পিরামিড তৈরি করা ফ্যাশান নয়, ছোটখাটো কোনো পিরামিড বা পিরামিড আকৃতির বাসগৃহও কেউ তৈরি করে না।

যাইহোক পিরামিড যদি আমেরিকাতেই তৈরি করা হয় তাহলে কোথায় তৈরি হবে, কত ব্যয় হবে, কতদিন সময় লাগবে, কত লোক লাগবে ইত্যাদি বিষয় সমীক্ষার জন্যে রাস মার্টিন নামে একজন উৎসাহী আমেরিকান আমেরিকার বড় বড় আরকিটেক্ট, এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কণ্ট্রাকটর ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিল।

পিরামিড কোথায় তৈরি হবে ? এক বাক্যে সকলে মত দিলেন অ্যারিজোনার মরু অঞ্চলে। অ্যারিজোনার কেন্দ্রে ভার্ড নদীর উপত্যকায় টুজিগুট-এ পুয়েবলো রেড ইণ্ডিয়ানরা পিরামিড তৈরি করতো। সেগুলি মিশরের

পিরামিডের মতো বিরাট না হলেও পিরামিড।
তবে এখন যদি অ্যারিজোনায় পিরামিড তৈরি করা হয় তাহলে সে পিরা-মিড তৈরি করা হবে সালোম শহর থেকে সতেরো মাইল দক্ষিণ পূর্বে। একজন জিওলজিস্ট বলেছেন এখানকার মাটি বড় পিরামিডের ভার বহনের উপযুক্ত। অন্য কারণের মধ্যে হলো এখানকার জল-হাওয়া পিরা-মিডের পক্ষে হানিকর হবে না। এখানকার জমিতে জল জমে না, বৃষ্টি ও বন্যার জল সহজে বেরিয়ে যায়। মাটির নিচে যে পাথর আছে তা বেশ মজবুত, সহজে ফাটবে না।
এছাড়া জায়গাটি ন্যাশানাল হাইওয়ে এবং রেললাইনের কাছে। ফিনিক্স শহর থেকে যারা ল্যাস ভেগাসে উড়ে যাবে তারা বিমান থেকে পিরামিড যদি তৈরি হয় —দেখতে পাবে।
এখানে জমি বেশ সস্তা, মাত্র ৫০ ডলার একর এবং চৌষট্টি হাজার ডলার জমি কিনলেই চলবে। জমি তো কেনা হলো তারপর সেখানে কলোনি তৈরি করতে হবে যেখানে কর্মী ও শ্রমিকরা থাকবে। সেখানে বিদ্যুৎ, জল, পরিবহন, টেলিফোন, পোস্ট অফিস, হাসপাতাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। নির্মাণকার্যের জন্যে পাওয়াব হাউস, ওয়াটার ওয়া-র্কস, বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা বসাতে হবে। সালোম থেকে কাজের জায়গা পর্যন্ত একটা রেললাইনও টানতে হবে। পিরামিড তৈরি হয়ে গেলে অনেক কাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে। সে সবের খরচ ধরে এ বাবদ ব্যয় হবে মোটামুটি আট থেকে নয় হাজার কোটি ডলার। আজকাল তো বাজার দর রীতিমতো চড়া।
পিরামিড নির্মাণের মূল জায়গাটি এবার লেভেল করতে হবে। এমনভাবে লেভেল করতে হবে যে আধ ইঞ্চিরও ফারাক যেন কোথাও না থাকে, আগাগোড়া ১২৫ একর জমি লেভেল করতে হবে। তার মধ্যে বিশেষ মনো-যোগ দিতে হবে ১৩·১ একর জমির দিকে কারণ ঠিক এর ওপর পিরা-মিড খাড়া করতে হবে। এই পুরো কাজটার জন্যে তিরিশ লক্ষ ঘন গজ বালি সরাতে হবে। এ কাজের জন্যে সাত হাজার কোটি ডলার খরচ

হয়ে গেল !

সৌভাগ্যক্রমে আজকাল নানা রকম কপিকল, ফর্ক লিফট, পাথর কাটার যন্ত্র, ভারি মাল স্থানান্তর যান, অনেক কিছু পাওয়া যায়। সেই চণ্ডী-দাসের খুড়োর 'পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে তিন ঘণ্টায় চলে' জাতীয় আজব কল পাওয়া যাবে। রোজ তো ২৪০০ খণ্ড পাথর সরাতে হবে।

ভিৎ করবার সময় যে-সব বিরাট বিরাট পাথর বসানো হবে তার জন্যে হেলিকপটার আনা হবে। হেলিকপটাররা সেই ভারি পাথর যথাস্থানে নামিয়ে দেবে। এইসব পাথরের প্রতিটির মাপ দশ ফুট বাই দশ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট ! এজন্যে হেলিকপটার ব্যতীত দৈনিক ৪০৫ জন শ্রমিক লাগবে। সেযুগে একাজে এক লাখ লোক লাগাতে হয়েছিল। এ বাবদ খরচ হবে ছ'কোটি ডলার।

পিরামিডটা তৈরি হবে প্রধানত লাইমস্টোন দিয়ে তবে চূড়োর জন্যে লাল গ্র্যানাইটের পরিবর্তে মারবেল দেওয়া হবে। লাইমস্টোনের দাম বেশি তারপর সেগুলি কাটার খরচও আছে। ইণ্ডিয়ানা স্টেটের বেডফোর্ড অঞ্চল থেকে এই লাইমস্টোন আনা হবে। দাম পড়বে ৬ ডলার প্রতি কিউবিক ফুট। প্রতিদিন যদি ১৫০০ পাথর আনা যায় তাহলে প্রয়োজনীয় পাথর চারদিনে আনা যাবে এবং টন পিছু খরচ পড়বে ৪৬'২০ ডলার।

এ পর্যন্ত নব্বুই হাজার কোটি ডলার খরচ হয়ে গেল তবে অনুমান করা হচ্ছে মোট খরচ হবে ১,৯৩০ ৩৯০,০০০ ডলার। এক শিফটে কাজ হলেও কাজ শেষ করতে ছয় বছর লাগবে। কাজ শেষ করে পাট গুটিয়ে আনতে সময় লাগবে আরও চার মাস।

যাক, পিরামিড তৈরি হোক তখন আমেরিকা আমাদের সাংবাদিকদের একদিন পিরামিড স্পেশালে চাপিয়ে আমেরিকান পিরামিড দেখিয়ে আনবেন। আমরা রিপোর্ট পড়ে ছবি দেখে, টি ভিতে সিনেমা দেখে সন্তুষ্ট থাকব।